সংস্কৃত নাটকের গল্প

শ্রীঅমিতা চক্রবর্তী

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৭৫

প্রকাশক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি গুড়িপাড়া রোড, কলিকাতা ৭০০ ০১৫

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত

দাম আট টাকা

মুখবন্ধ

শেক্সপিয়ারের নাট্যবস্তুকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্যভাবে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করাই সম্ভবতঃ সুলেখক চার্লস্ ল্যাম্বের উদ্দেশ্য ছিল এবং এবিষয়ে তাঁর সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। অবশ্য ক্ষমতার দিক থেকে সূর্যের সঙ্গে প্রদীপের তুলনা অসমঞ্জস হলেও মৌল উদ্দেশ্যের সাযুজ্যই এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা। সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরকে যে রসবস্তু আবদ্ধ তাকে মাতৃভাষার সহজতর খাতে প্রবাহিত করে তৃষ্ণার্তের অঞ্জলিপূরণই রচয়িত্রীর বাসনা—সার্থকতা গুণিজনের বিচার্য।

সংস্কৃত নাট্যকাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীর প্রয়োজনে রামায়ণ-মহাভারতের দ্বারস্থ। প্রাচীন 'এপিকে'র কাছে পরবর্তী সাহিত্যের এই ঋণ শুধু এদেশেই নয়—যে-কোনো দেশেই স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত। অবশ্য প্রতিভা ও 'স্বকপোলকল্পনা' যে অবিচ্ছেদ্য, তারও নিদর্শন বিরল নয় সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের জগতে। ভাস-কালিদাস-শূদ্রক-বিশাখদত্ত প্রমুখ দিক্‌পালদের রচনায় মৌলিক কাহিনীরও অভাব নেই। আবার যেখানে প্রচলিত পুরাণ-কথাই উপজীব্যরূপে গৃহীত, সেখানেও প্রয়োগকলা (treatment) নাট্যকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব। আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে—প্রধানতঃ সেই সব কাহিনী যেগুলি নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনায় পরিপুষ্ট ও বিশদায়িত। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা বহু—কাহিনীর বৈচিত্র্যও অপরিমেয়। কিন্তু এই গ্রন্থের পরিসরগত পরিমিতির প্রয়োজনে মাত্র দশটি উল্লেখ্য গল্প স্থান দেওয়া হ'লো। মূলের বাতাবরণ বজায় রাখার তাগিদে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃতি সংযুক্ত হয়েছে। মোটামুটিভাবে স্বীকৃত কালানুক্রম অনুসারেই রচয়িতারা অগ্রাধিকার পেয়েছেন। 'ভূমিকা' অংশে সংশ্লিষ্ট হয়েছে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি-সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদগুলির সার-সংক্ষেপ। পুনরুক্তি হলেও একথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে পণ্ডিত-মহলের জন্যে এই গ্রন্থরচনা নয়।

যখন সন ১৩৭৩ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার কয়েকটি রবিবাসরীয়

সংখ্যাতে পাক্ষিকভাবে এই সংকলনের পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয়—তখনই সাধারণ্যে আগ্রহ লক্ষিত হয়েছিল; অনেকেই উৎসাহ দিয়েছিলেন পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্যে। সর্বাগ্রে তাই ধন্যবাদভাজন এই সংখ্যার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সুলেখক শ্রীরমাপদ চৌধুরী মহাশয়।

যাঁদের ঔদার্য ও সহমর্মিতা ব্যতীত 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ' আমার প্রচেষ্টা হতো বন্ধ্যা, কৃতজ্ঞতা জানাই সুখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা সাহিত্য সংসদের সেই বিদ্যোৎসাহী কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ও নিষ্ঠাবান স্থিতধী কর্মাধ্যক্ষ শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ মহাশয়কে। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মিবৃন্দের অকৃপণ সহযোগিতাও অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। প্রণাম জানাই আচার্য দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয়কে যিনি এই তুচ্ছ প্রচেষ্টাকেও উৎসাহ দানের মাধ্যমে এই সত্যকে প্রমাণ করলেন—'উত্তম নিশ্চিতে চলে অধমের সাথে।'

দিবা তপতি তপনঃ সহস্রকিরণজালৈঃ।
নক্তন্তু কুটিরতমঃ নশ্যতি প্রদীপশিখা॥

১২ই কার্তিক ১৩৮২
৩৪/এ পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা-৩৪

৺মায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলাভাষায় 'নাটক' বা ইংরাজী 'ড্রামা' শব্দের যথার্থ সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'দৃশ্যকাব্য'। সবদেশে ও সবকালেই সাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয়, দোষগুণ-নিরূপণ ও শ্রেণীবিভাজনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন সাহিত্য-সমালোচকেরা। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই সাহিত্য আলোচনাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতে যে সমৃদ্ধ বিভাগটি গড়ে উঠেছে তার নাম 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' আর যাঁরা এই শাস্ত্রের মৌলিক আলোচনা করে গেছেন তাঁরা 'আলঙ্কারিক'। ভরত, ভামহ, বামন, আনন্দবর্ধন, মম্মট, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ আলঙ্কারিকদের রচনা সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার দিগ্‌দর্শন। এঁরা যে শুধু কাব্যের অলঙ্কার-দোষ-গুণ বা কাব্যের প্রাণ হিসাবে রস-রীতি-ধ্বনি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক্ নির্দেশ করেছেন তাই নয়, কাব্যের বহুধা বিচিত্র প্রকৃতি আলোচনার পর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন ও তাদের স্বরূপনির্ণয়ের মাধ্যমে যথার্থ মূল্যায়নের চেষ্টাও করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত 'কাব্য' শব্দটি সাধারণভাবে সাহিত্যের সমার্থবাচক। আলঙ্কারিকরা সংস্কৃত কাব্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—দৃশ্য ও শ্রব্য। বলা বাহুল্য, নামকরণ থেকেই এদের পার্থক্য অনুমেয়—আবৃত্তি বা পাঠগুণে যে কাব্য উপভোগ করা হয় তা 'শ্রব্য', আর যে কাব্য রঙ্গমঞ্চে নট কর্তৃক অভিনয় হেতু দর্শনীয় তা 'দৃশ্য'।[১] এখন 'অভিনয়' কী? শাস্ত্রমতে রামপ্রমুখ নায়কদের অবস্থার অনুকরণই অভিনয়[২]। অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে কথোপকথনের দ্বারা বেশভূষা সংগ্রহ করে বা দুঃখ-বেদনা প্রকাশের মাধ্যমে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে এই অভিনয় করা হ'তো।[৩]

দৃশ্যকাব্যের প্রধান বিভাগ দু'টি—রূপক ও উপরূপক। লক্ষণের ভিন্নতার জন্য রূপকের দশটি ও উপরূপকের আঠারোটি উপবিভাগ স্বীকার করা হয়েছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের পরিভাষায় 'নাটক' দৃশ্যকাব্যের রূপক শাখারই

---

১ সাহিত্যদর্পণ— বিশ্বনাথ কবিরাজ—৬।২৭৫

২ ঐ

৩ ঐ

একটি উপশাখামাত্র।[৪] কিন্তু যেহেতু 'নাটক' শব্দটি ও তার ব্যঞ্জনার সঙ্গে আমরা মোটামুটিভাবে পরিচিত সেহেতু এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র 'ড্রামা' বা 'দৃশ্যকাব্য' বোঝাতে সাধারণভাবে এই শব্দটিই ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকের বিষয়বস্তু ও গঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে দেখা যাক্। কোনো বিখ্যাত বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে নাট্যকাহিনী। নাটকের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত, গুণবান্ রাজা বা উচ্চবংশীয় কোনো বীরপুরুষ। দৃশ্যকাব্যে নায়ক-নায়িকা ছাড়াও উল্লেখ্য চরিত্র হিসাবে নায়িকার সখীরা (শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, 'রত্নাবলী'তে সুসংগতা ইত্যাদি), রাজার পার্শ্বচর বিদূষক (বসন্তক, মাধবক), এমন কি কোনো কোনো নাটকে খলনায়কের (মৃচ্ছকটিকে শকার) উপস্থিতি লক্ষণীয়। অনেক নাটকে আবার মূলকাহিনীর পাশাপাশি একটি উপকাহিনীও নাট্যরসকে ঘনীভূত করার পথে সহায়তা করেছে।[৫] 'শৃঙ্গার' বা 'বীর' কোনো একটি রসের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য রসও অপ্রধানভাবে থাকতে পারে। অঙ্কসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ। মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ-নির্বহণ নামে পাঁচটি নাটকীয় অঙ্গ থাকবে—এক কথায় এগুলিকে বলা হয় 'পঞ্চসন্ধি'। এগুলি আসলে নাটকীয় কথাবস্তু তথা প্লটের অগ্রগতির পথে পাঁচটি স্তর। মুখসন্ধিতে যে কাহিনীর উন্মোচন, প্রতিমুখ ও গর্ভসন্ধিতে তা আরও বিকশিত। তারপর যেখানে আপাতসমাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও ঘটনার গতি সহসা পরিবর্তিত হয়ে জটিলতর আকার ধারণ করে তখনই বিমর্ষ-সন্ধি আর নির্বহণ-সন্ধিতে সব জটিলতার অবসানে নাট্যকারের অভীষ্ট পরিসমাপ্তি সাধিত হয়। শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্তের আশ্রমে আগমন, শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রেমের বীজ বপনের দ্বারা প্লটের প্রাথমিক স্তরবিন্যাস—পরে নানা ঘটনার মাধ্যমে সখীদের সহায়তায় এই আকর্ষণ আরও বিকশিত; ৩য় অঙ্কে শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের গান্ধর্বরীতিতে বিবাহের দ্বারা গর্ভসন্ধি পরিস্ফুটিত। কিন্তু ৪র্থ অঙ্কে দুর্বাসার অভিশাপ ঘটনার গতিকে পরিবর্তিত করে দিল— মিলনের পথে দেখা দিল অন্তরায়। অবশেষে বিচ্ছেদ-দহনে পরিশুদ্ধির পর সপ্তমাঙ্কে রাজা

৪ রূপক—নাটক, প্রকরণ, ভান, ব্যায়োগ ইত্যাদি। উপরূপক—নাটিকা, সট্টক ইত্যাদি।
—সাহিত্য দর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ।

৫ যেমন 'মালতী-মাধব'—মকরন্দ-মদয়ন্তিকা—ভবভূতি।

দুষ্যন্তের সঙ্গে সপুত্র শকুন্তলার বাঞ্ছিত মিলন সম্ভব হলো—এখানেই নির্বহণ-সন্ধি।

সংস্কৃত নাটকে হত্যা, মৃত্যু, যুদ্ধ, দূরাহ্বান বা কোনো অশ্লীল ব্যাপার নিষিদ্ধ ; সাধারণতঃ এখানে ট্রাজেডিও অনুপস্থিত। [অবশ্য নাট্যকার ভাস অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন—যথাস্থানে তা আলোচিত হবে।] আরম্ভে নান্দীশ্লোকের মাধ্যমে দেব-ব্রাহ্মণ-রাজার স্তুতিকথন ও আশীর্বাদ প্রার্থনার পর সূত্রধার নটীর সঙ্গে কথোপকথনের সাহায্যে নাট্যবস্তু উপস্থাপিত করেন। যেমন শকুন্তলা নাটকের 'প্রস্তাবনা'তে দেখি—সূত্রধার এসে পত্নী নটীকে বলছেন—'এই বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সামনে কালিদাস-বিরচিত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হবে। তার আগে তুমি একটি গান গাও।' নটীর গান শুনে সূত্রধার মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে আছেন। এমন সময়ে নটী নাটকের কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় সূত্রধার বললেন—'মনোহারী এই সঙ্গীত আমার চিত্তকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন করে রাজা দুষ্যন্ত বেগে ধাবমান মৃগকে অনুসরণ করে আশ্রমের দিকে আকৃষ্ট হয়ে আসছেন।'[৬] এরপরই সূত্রধারের বর্ণনা অনুসারে দুষ্যন্তের মঞ্চে আগমন ঘটল।

ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় নায়ক ও অন্যান্য প্রধান পুরুষ-চরিত্রের ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃত হলেও সাধারণতঃ নারীদের ও নিম্নস্তরের পুরুষচরিত্রদের কথোপ-কথনের মাধ্যম প্রাকৃত। শ্লোকগুলির যোগসূত্র অবশ্য গদ্য। সাধারণতঃ নারী ও নিম্নস্তরের পুরুষচরিত্রের মুখে প্রাকৃতভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের শেষে থাকে স্বস্তিবাচন যার আলঙ্কারিক পরিভাষা 'ভরতবাক্য'। সংক্ষেপে এইগুলিই সংস্কৃত নাটক রচনার তত্ত্বগত দিক্। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রমাণ করে যে সংস্কৃত নাট্যরচনা ছিল যথেষ্ট নিয়মবদ্ধ ও পরিশীলিত।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি

যে-কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টির মূলে থাকে এক প্রাথমিক সূচনার ইতিহাস, যা বিকাশের ধারা বেয়ে সুপরিণতির পথে পৌঁছাতে সমর্থ। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরচনার উৎস খুঁজতে গিয়ে উৎসাহীদের হতাশ হতে হয় এই কারণে যে সবচেয়ে পুরাতন নাটক হিসাবে পরিচিত অশ্বঘোষ বা ভাসের রচনাও এত

---

৬ শকুন্তলা-কালিদাস—প্রস্তাবনা ১, ৫

সুগঠিত ও পরিণত আঙ্গিকবিশিষ্ট যে এই সমস্ত রচনা নাটকের সূচনা হতে পারে না। তবে কোথায় সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি? ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবাসুর-যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেবতারা এক বিজয়োৎসব করেন; উৎসবে ঐ যুদ্ধের অনুকরণ করা হয়। এই অনুকরণ দেখে সকলেই আনন্দিত হন, আর এর থেকেই নাট্যের উৎপত্তি। ক্রমে ইন্দ্রের অনুরোধে স্বয়ং ব্রহ্মা ঋগ্‌বেদ থেকে কথোপকথন, সাম থেকে সঙ্গীত, যজুস্‌ থেকে অভিনয় আর অথর্ববেদ থেকে রস ও অনুভূতি গ্রহণ করে নটরাজের তাণ্ডব ও পার্বতীর লাস্যনৃত্যের সমবায়ে গঠন করলেন এই নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদ যাতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমান অধিকার স্বীকৃত হ'লো। পরে মহর্ষি ভরত 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণয়ন করে পৃথিবীতে জনগণের শিক্ষার্থে এই নাট্যকলা প্রচার করেন। অতএব শাস্ত্র অনুসারে নাট্যের উৎপত্তি দেবলোকে।[৭] বলা বাহুল্য, যুক্তিশীল মন এই দৈব উৎপত্তির মতবাদে সায় দেয় না; এইজন্যে আধুনিক যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বিচার ও বিশ্লেষণের সাহায্যে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও এই জাতীয় কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা এখানে আলোচনা করা যাক্।

সংস্কৃত নাটকের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করে দেখা যাচ্ছে প্রাচীনতম রচনা ঋগ্‌বেদে এমন কতগুলি সূক্ত (মন্ত্রসমষ্টি) আছে যেগুলিকে বলা চলে সংবাদসূক্ত (dialogue hymn)[৮]। যম-যমী, পুরূরবা-উর্বশী, পণি-সরমা ইত্যাদি সূক্তগুলি পারস্পরিক সংলাপের আকারে পরিবেশিত। নাটকেও সংলাপেরই প্রাধান্য; অতএব এই সূক্তগুলিতে নাট্যসাহিত্যের বীজ নিহিত—এমন কথা মনে করা নিশ্চয় অন্যায় নয়। মনীষী কীথ[৯] ও তাঁর অনুসরণে হার্টেল (Hertel) এই মতবাদে বিশ্বাসী। আবার অনেকে মনে করেন যে বৈদিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞ-প্রধান ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় নাচগান ও অভিনয়মূলক অনুষ্ঠান হ'তো। যেমন সোমযাগে কলহ ও যুদ্ধের অভিনয় করে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতা বলপূর্বক সোমলতা সংগ্রহের পর যজ্ঞ নিষ্পন্ন করতেন।

৭ নাট্যশাস্ত্র—ভরত, ১, ১,৭৫

৮ ঋ. সং ১০-১০, ৯৫, ১০৮

৯ Sanskrit Drama—Keith, p. 15

মহাব্রত[১০] যাগে অনুষ্ঠিত একখণ্ড চর্মের অধিকার নিয়ে বৈশ্য ও শূদ্রের ছদ্ম বিবাদ ও পরে বৈশ্যের জয়লাভ—ইত্যাদি ব্যাপারগুলিও ধর্মানুষ্ঠানের অভিনয়-মূলক অঙ্গ। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলিকে (Ritual Drama) নাটকের উৎস বলে স্বীকার করে নিতে অনেকেই অক্ষম। তাঁরা বলেন, মানুষের জীবনের স্বাভাবিক রসানুভূতির ফলেই নাটকের জন্ম। অতএব ধর্মকে এর মধ্যে টেনে আনা যুক্তিযুক্ত হবে না। অধ্যাপক হিলব্রাণ্ট, স্টেনকোনো প্রমুখ পণ্ডিতেরা নাটকের উৎপত্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের কথা অস্বীকার করেছেন। পুতুলনাচ[১১], ছায়ানৃত্য[১২]—এগুলিকেও অনেকে নাটকের আদিরূপ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, নাটকে সূত্রধারের উপস্থিতি তো পুতুলনাচের সূত্রধারণের অনুবর্তন। বেবর (Weber) প্রমুখ পণ্ডিতেরা আবার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ওপর গ্রীক প্রভাব প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর ভারত গ্রীক-সান্নিধ্য লাভ করে। পশ্চিম ভারতে যে গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে সেখানেই প্রথম নাটকের অভিনয় হয়। এই ভাবে গ্রীক নাটকের প্রভাবেই গড়ে ওঠে সংস্কৃত নাটক। উজ্জয়িনী ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্রও প্রমাণিত। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত 'যবনিকা', 'যবনী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ, আংটি-সংগমমণিজাতীয় অভিজ্ঞানের ব্যবহার, আখ্যানগত সাদৃশ্য—যেমন অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর প্রতি নায়কের আকর্ষণ, নায়িকার ছদ্মপরিচয়ে অবস্থান, অবশেষে বহু বাধাবিপত্তির পর বাঞ্ছিত মিলন—ইত্যাদি ঘটনাগুলি এঁদের মতে গ্রীক প্রভাবের দ্যোতক। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে 'যবন' শব্দটি শুধু 'গ্রীক' অর্থ বোঝাতেই নয়, সেকালে গ্রীস অধিকৃত পারস্য-ব্যাক্‌ট্রিয়া-সিরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসী সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হ'তো। দ্বিতীয়তঃ, তখনকার গ্রীসীয় নাটকের অভিনয়ে যবনিকার ব্যবহার ছিল বলে কোথাও উল্লেখ নেই। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সিলভাঁ-লেভি বলেন, সম্ভবতঃ পারস্য থেকে আনীত পরদা 'যবনিকা' আখ্যা পেয়েছিল। আবার গ্রীক নাটকের স্থান-কাল-ঘটনাগত ঐক্যের ব্যাপারটিও সংস্কৃত নাটকে অনুসৃত হয়নি। নায়কদের স্বর্গমর্ত্যে

---

১০ শ, সং—৩.৪, ৫, পঞ্চ-বিং ব্রাহ্মণ—৫৫-১৪

১১, ১২ Pischel, Lüders

অবাধ-গতি, দু'টি ঘটনার ভিতর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান অ্যারিস্টটেলীয় ত্রিমুখী ঐক্যনীতির বিপরীত। তাছাড়া, সাদৃশ্য থাকলেই অনুকরণ মনে করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক-প্রসঙ্গ আলোচনায় মূল বক্তব্য থেকে সরে আসা হয়েছে। প্রশ্নটি আসলে প্রভাব-সংক্রান্ত নয়, প্রশ্নটি উৎপত্তির। গ্রীক নাটক দেখে এসে এদেশের কবি নাটক রচনা করতে শিখলেন—এ কেবল অনুমান ও কল্পনা; যুক্তি এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। যাঁরা বেদ-উপনিষদের মত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ, ব্যাকরণ-ছন্দ-জ্যোতিষ-অলঙ্কারের মত বিভিন্ন শাস্ত্র ও কাব্য-রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিলেন, তাঁরা শুধু নাটক-রচনার জন্যেই পাশ্চাত্ত্যের দ্বারস্থ হবেন—এমন সিদ্ধান্ত একদেশদর্শিতার নামান্তর নয় কি ?

বস্তুতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের আগেও যে নট এবং নাট্যের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ পাণিনি-পতঞ্জলি প্রমুখ বৈয়াকরণরা। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে পাণিনি নটসূত্র অর্থে 'শৈলালিন্' শব্দের উল্লেখ করেছেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলির 'কংসং ঘাতয়তি', 'বলিং বন্ধয়তি' ইত্যাদি প্রয়োগ পৌরাণিক কৃষ্ণ-কাহিনীর অভিনয় এবং 'নটস্য গাথাং শৃণোতি', 'গ্রন্থিকস্য শৃণোতি' ইত্যাদি প্রয়োগ নটকর্মের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। পতঞ্জলির দৃষ্টান্ত থেকে বর্তমান দশকের বিবুধ সমালোচক যে মত প্রকাশ করলেন তা হচ্ছে দৃশ্য-কাব্য প্রয়োগের রীতি ছিল তিনটি—নৃত্যাভিনয়, পুতুলনাচ ও কথকতা। শোভনিকেরা যথাযথ বেশভূষা করে পৌরাণিক কাহিনীর নৃত্যাভিনয় দেখাতেন, পুতুল প্রদর্শনী বা চিত্রের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলিই সাধারণ্যে প্রদর্শিত হ'তো, আর গ্রন্থিকেরা কাহিনী পাঠ করে শোনাত।[১৩]

নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। নাটকের কাহিনীর জন্যে প্রায় সমস্ত নাট্যকারই এই দু'খানি গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। ভাস-কালিদাস-ভবভূতি-রাজশেখর প্রমুখ নাট্যজগতের দিক্‌পালরা কথাবস্তু চয়নে এই গ্রন্থ দু'খানিকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'নট' শব্দটির উপস্থিতি মহাভারতে দেখা যায়; অবশ্য অভিনেতা অর্থেই এই শব্দের প্রয়োগ কি না এ বিষয়ে সকলে একমত নয়। 'গীতা' বা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশটি কথোপকথন-জাতীয়—অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর। বস্তুতঃ

১৩ শ্রীসুকুমার সেন—'নট-নাট্য-নাটক'—পৃঃ ১৬

সমগ্র মহাভারতটিই সূতের বক্তব্যরূপে বিধৃত। বাল্মীকির পরিচালনায় রামায়ণ গান করেছিলেন 'লবকুশ'; নাটকীয় পাত্রপাত্রীকেও বলা হ'তো 'কুশীলব'। অবশ্য নাটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মূল রামায়ণ-মহাভারতে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাহ্য প্রমাণ যাই থাক, নাটকগুলির আভ্যন্তর বিশ্লেষণ সংস্কৃত নাটকের প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করবে। প্রকৃতই রাজসভার পৃষ্ঠপোষিত সংস্কৃত কাব্যের (Court Poetry) বহু লক্ষণই নাটকে বিদ্যমান। সেই কৃত্রিম প্রকাশভঙ্গী, সেই বর্ণনাবাহুল্য, সেই ছন্দো-বন্ধন, অলঙ্কার-প্রয়োগ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে শৃঙ্গারাদি রসসৃষ্টি। সেই রকমই রাজা বা উচ্চবংশীয় নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য। বৈশিষ্ট্য শুধু কাহিনীর কিছু নাটকীয় গতি, কখনও বা সংঘাত এবং বিদূষক-জাতীয় চরিত্রের হাস্যরস-সৃষ্টির মাধ্যমে নাটকীয় অবকাশ (dramatic relief) ইত্যাদি। অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য শুধু কাব্য নয়, কাব্য এবং আরও বেশী কিছু। আলোচিত মতগুলির বিশেষ একটিকেই এর উৎপত্তির কারণ হিসাবে নির্দেশ করা চলে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেদে যা ছিল বীজাকারে, রামায়ণ-মহাভারতের রসধারায়, গ্রীকসংযোগের অনুকূল বায়ুস্পর্শে, সর্বোপরি ভারতীয় প্রতিভা-সূর্যের আলোকে সেই নাট্যমহীরুহের বিকাশ। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের মতবাদের অলৌকিকত্বটুকু বাদ দিলে এই মত বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য। নাট্যরস ও কাব্যধর্ম—এই দু'য়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য সার্থক শিল্পে উত্তীর্ণ।

২

এই সাহিত্যকর্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গেলে নাট্যকারদের কালানুক্রমিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের যে-কোনো শাখায়ই রচয়িতাদের প্রকৃত সময়-নির্ণয় দুঃসাধ্য; কারণ খুব কমক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের জীবন ও সময় সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিবরণ বা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাছাড়া অনেক সময়ই উদ্ধার-করা পুঁথি-গুলির প্রথম ও শেষ অংশ হয় ছিন্ন, নয় কীটদষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে।

অতএব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্বল হয় অনুমান, নয়তো প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি। তবুও পণ্ডিতবর্গ নানা যুক্তি-প্রমাণের উপর নির্ভর করে সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন।

অশ্বঘোষ ঃ অশ্বঘোষের লেখা 'সারিপুত্রপ্রকরণ'ই প্রাপ্ত সংস্কৃত নাটক-গুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। কিন্তু এর পরিণত রীতি প্রমাণ করে যে এই নাটকটিই প্রথম নাটক নয়; নিশ্চয় অশ্বঘোষেরও পূর্বসূরি ছিলেন—কিন্তু বহু সংস্কৃত গ্রন্থের মতো তাঁদের রচনা হয় লুপ্ত নয়তো আজও অনাবিষ্কৃত। লক্ষণীয়, খৃষ্টীয় ১ম শতকে কুষাণ রাজত্বের সময় এই বৌদ্ধ নাটকের রচনা, যখন ভারত গ্রীক-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। এই নাটকের লুপ্ত পুঁথি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়া থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকর্তা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Lüders। নাটকটি নয় অঙ্কে বিভক্ত—'সারিপুত্র' ও 'মৌদ্গল্যায়ন' নামে দুই যুবক ব্রাহ্মণের বুদ্ধের কাছে দীক্ষাগ্রহণের বিষয়টিই নাটকের প্রতিপাদ্য। এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যে আরও নাটকের পাণ্ডুলিপি ছিল তারও প্রমাণ আছে—কিন্তু খুবই শোচনীয় অবস্থার জন্য পাঠ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরানন্দ' ইত্যাদি কাব্যগুলি নাট্যকার অশ্বঘোষের কবিখ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কিংবদন্তীমূলক জীবনী থেকে জানা যায়—সুবর্ণাক্ষীর পুত্র ব্রাহ্মণ অশ্বঘোষ পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠার জন্যে তাঁকে 'মহাকবি', 'আচার্য', 'ভদন্ত' ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হয়। পরে তিনি কুষাণরাজ কনিষ্কের পোষকতা লাভ করে কবি হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস তাঁকে দিয়েই শুরু।

অশ্বঘোষের নয়-অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকে গদ্য ও পদ্য দু'য়েরই মিশ্রণ আছে। বুদ্ধ সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ইত্যাদি মুখ্য চরিত্রের ভাষা সংস্কৃত হলেও বিদূষকের ভাষা প্রাকৃত। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারে পরবর্তী সংস্কৃত নাটকেও যেমন এখানেও তেমনি অন্যান্য রীতিপদ্ধতি প্রায় সবই পালিত হয়েছে, এমন কি গদ্য-পদ্যের ও সংস্কৃত প্রাকৃতের মিশ্রণও আছে। শুধু তাই নয়, বিদূষকের উপস্থিতি অশ্বঘোষের নাটকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভাস—ভাস একজন নাট্যকার, যিনি শুধুমাত্র নামেই পরিচিত ছিলেন বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। কালিদাস পূর্বসূরি হিসাবে সৌমিল্ল

ও কবিপুত্র নামে নাট্যকারের সঙ্গে ভাসেরও নামোল্লেখ করেছেন তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে।[১৪]

এছাড়া বাণভট্ট[১৫] প্রমুখ আরও একাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত কবিও ভাসের কবি-প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। রাজশেখর[১৬] বলেছেন, 'ভাসের আর সব নাটক সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় ভস্মীভূত হলেও স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকটি অক্ষতই থেকে গেল।' কিন্তু পণ্ডিত টি. গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে ১৯১০-১১ সালে ত্রিবান্দ্রাম থেকে ভাসের 'নাটক চক্র' বলে প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমরা অন্ধকারে ছিলাম। যে তেরটি নাটক তিনি এইভাবে আবিষ্কার করেন তার কতকগুলির কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া (মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ), আবার কতকগুলির বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে সংগৃহীত (প্রতিমা-নাটক, অভিষেক নাটক)। এ ছাড়া হরিবংশ (বালচরিত) ও গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে অবলম্বন করে, আর নিজের কল্পিত কাহিনী দিয়ে (স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক, চারুদত্ত) একাধিক নাটক রচিত। গণপতি শাস্ত্রী দাবী করেন, এই তেরটি নাটকই ভাসরচিত নাটক-চক্রের অন্তর্গত। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। বহু দেশীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত[১৭] শাস্ত্রীজীর দাবীকে নস্যাৎ করে দিলেন ; কারণ পাণ্ডুলিপিতে কোথাও ভাসের নাম বা সন তারিখের পরিচয় নেই। তাছাড়া ভাসের নামে যে সমস্ত শ্লোক 'সংগ্রহ গ্রন্থ'গুলিতে স্থান পেয়েছে সেগুলির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত নাটকগুলিতে অনুপস্থিত। কিন্তু যেহেতু এঁদের যুক্তি নিতান্তই নেতিবাচক এবং আর কোনো পাণ্ডুলিপি উদ্ধার সম্ভব হয়নি যেগুলি ভাসের রচনা বলে সকলের স্বীকৃতি পেতে পারে—

---

১৪ প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্·········মা. মি. (১)

১৫ সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥

—হর্ষচরিত

১৬ ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

১৭ কাণে, বার্ণেট, পিসারোডি।

সেহেতু শাস্ত্রীজীর মতের উল্লেখ্য দিক্‌গুলিকেই আপাততঃ তুলে ধরা হচ্ছে। অবশ্য কীথ, টমাস, পরাঞ্জপে প্রমুখ বহু প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ শাস্ত্রীজীর মতের সমর্থন করেছেন। গণপতি শাস্ত্রীর প্রধান বক্তব্য হ'লো, উদ্ধার-করা তেরটি নাটক একই হাতের কাজ। কেননা (ক) এমন অনেক শ্লোক বা বাক্যাংশ আছে যা একাধিক নাটকেই স্থান পেয়েছে।[১৮] (খ) প্রারম্ভিক নান্দীশ্লোক ও নাট্যান্তিক ভরতবাক্য[১৯] অনেক ক্ষেত্রে একই রকম। (গ) কালিদাস ও পরবর্তী যুগে যেখানে নান্দীশ্লোক পাঠের পর 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' বলা হয় সেখানে এই নাটকগুলি শুরুই হচ্ছে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এই বক্তব্য দিয়ে। (ঘ) অন্যান্য নাটকে প্রথমাংশের নাম 'প্রস্তাবনা', কিন্তু ভাস সর্বত্র ব্যবহার করেছেন 'স্থাপনা' শব্দটি। (ঙ) ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। অনেকস্থলেই অপাণিনীয় প্রয়োগ দেখা যায়। চরিত্রসৃষ্টিতেও মিল আছে, একাধিক নাটকে একই চরিত্রের উপস্থিতি, যেমন যৌগন্ধরায়ণ। (চ) একাধিক ক্ষেত্রে ভরতীয় নাট্যশাস্ত্রের রীতি লঙ্ঘন করে দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ ইত্যাদি মঞ্চের ওপর প্রদর্শিত হয়েছে।[২০]

এই সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ থেকে এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে এই নাটকগুলি একই ব্যক্তির লেখা এবং তাঁর ভাস নামে যশস্বী কবি হতে বাধা নেই, যেহেতু রচনাগুলি তাঁর খ্যাতিরই অনুরূপ। অবশ্য অনেকে মনে করেন, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দক্ষিণ ভারতীয় নাট্যরীতির প্রভাবে জাত।

শুধু কালিদাস উল্লেখ করেছেন বলে নয়, ভাসের রচনাশৈলী ও ভাষাও কালিদাস-পূর্বযুগের স্বাক্ষর বহন করছে। আবার অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'র প্রভাব ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের ওপর অনেকে লক্ষ্য করেছেন। অতএব তিনি অশ্বঘোষের পরবর্তী। অবশ্য ভিণ্টারনিৎসের[২১] মতে ভাস অশ্বঘোষের চেয়ে কালিদাসের বেশী কাছাকাছি। তাঁর সময়সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে তাঁকে অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এত আলোচনা সত্ত্বেও ভাস-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে একথা বলা

---

১৮ লিম্পতীব তমোহঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ (১ম অঙ্ক—বালচরিত, চারুদত্ত)

১৯ স্বপ্ননাটক, বালচরিত, দূতবাক্য।

২০ উরুভঙ্গ, অভিষেক নাটক।

২১ Winternitz, Some Problems of Indian Literature, pp. 123-24

চলে না। তবে পণ্ডিতেরা যাই বলুন, তাঁর খ্যাতি যে শুধু কালিদাস-বাণভট্টের উক্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, তাঁর সুনাম যে দণ্ডীকে অতিক্রম করে জয়দেবের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার প্রমাণ এঁদের সপ্রশংস উক্তি।[২২] প্রকাশিত নাটকগুলিও তাঁর সুযশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কালিদাস ঃ এবার আসা যাক সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের সূর্য কালিদাসের প্রসঙ্গে। 'কুমারসম্ভব'-'রঘুবংশ' মহাকাব্যদ্বয়, মেঘদূত-ঋতুসংহার ধরনের গীতিকাব্যগুলি বাদ দিলেও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', বিক্রমোর্বশীয়ম্'—এই তিনখানি দৃশ্যকাব্যের জন্যেই তিনি অমরত্বের দাবী করতে পারেন। এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে শকুন্তলা নাটক। গ্যেটের সপ্রশংস উক্তি[২৩] ও তাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মূল্যায়ন সাহিত্যরসিক মাত্রেরই সুবিদিত। পাশ্চাত্ত্য ও আধুনিক সমালোচকদের উচ্চপ্রশংসা বাদ দিলেও প্রাচীন বিদগ্ধজনের কাছেও এই নাটকের সমাদর ছিল অপরিসীম। উচ্চকণ্ঠেই তারা ঘোষণা করেছেন, 'কালিদাসের সর্বস্ব এই অভিজ্ঞান শকুন্তলা'।[২৪] তাঁরা আরও বলেছেন, কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক, নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শকুন্তলা, আবার এই নাটকের মধ্যেও উত্তম অংশ চতুর্থ অঙ্কটি যেখানে শকুন্তলা বিদায় নিচ্ছেন আশ্রমজীবন থেকে। কিন্তু প্রাচী-প্রতীচী নির্বিশেষে সকলেরই কালিদাস সম্বন্ধে কেন এই স্তুতিভাষণ? বস্তুত তাঁর কাব্যসৃষ্টির চমৎকৃতির জন্যেই। যথাস্থানে যথাযথ উপমা প্রয়োগ ('উপমা কালিদাসস্য'), প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, সৌন্দর্যপ্রীতি, মানবিকতা-বোধ ইত্যাদি দিকৃগুলিকে আলাদাভাবে তুলে ধরে কালিদাসের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যে কখনও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলপান করেনি তাকে কি 'হাইড্রোজেন-অক্সিজেন' নামে দু'টি গ্যাসের মিলনে জলের সৃষ্টি হয় এই জাতীয় বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান দান করে জলের স্বরূপ বোঝান সম্ভব? তেমনি কালিদাসের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ব্যতীত শুধুমাত্র কাব্যগুণের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামগ্রিক রস গ্রহণের আশা দুরাশা।

---

২২ ভাসো হাসঃ—খ্রীঃ ১৩ শতকের কবি জয়দেবের প্রসন্নরাঘব।

২৩ প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ—শকুন্তলা। কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি স্বর্গ ও মর্ত একত্রে দেখিতে চায় তবে তাহা শকুন্তলায় পাইবে।"

২৪ কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

যে যে গুণে কবি কালিদাসের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত সেগুলির পুনরাবৃত্তি না করে এখানে বিশেষভাবে তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। স্যার উইলিয়াম জোন্স তাঁকে যে 'ভারতীয় শেক্সপীয়ার' আখ্যা দিয়েছেন, একথা মনে রেখেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পাশ্চাত্য নাট্যকারের সঙ্গে ভারতীয় নাট্যকারের, বিশেষতঃ শেক্সপীয়ারের সঙ্গে কালিদাসের সাদৃশ্য কিছু থাকলেও পার্থক্যই বেশী। পার্থক্যের মূল কারণ এই যে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য, ইংরেজ ও ভারতীয় দুই জাতির জীবনের আদর্শ বিভিন্ন, জীবনের প্রতিচ্ছবি নাটকের আদর্শও পৃথক্। আমরা জানি, ভাব ও রস ভারতে যেমন ধর্মের, তেমনি সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যেরও জীবনস্বরূপ। এইজন্য সংস্কৃত নাট্যকারের লক্ষ্য ঘটনার মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশ। কালিদাস ভাব ও রসের আধার; শেক্সপীয়ার ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণের যাদুকর। কালিদাসের কাব্য-নাটকে পাই মানবহৃদয়ে মহিমময় আদর্শের প্রতিষ্ঠা; শেক্সপীয়ারের নাটকে লক্ষ্য করি বাস্তবজীবনের সমস্যা ও বিভিন্ন চরিত্রে মানবহৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের প্রতিফলন। অতএব শেক্সপীয়ারের সৃষ্ট চরিত্র ও তাঁর প্রকাশভঙ্গীর ইন্দ্রজাল তাঁর অন্ততঃ হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী কবি কালিদাসের নাটকে সন্ধান করা বৃথা।

অবশ্য আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে বিচার করলে একথা অস্বীকার করা চলে না যে কালিদাসের নাটকে অভাব আছে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের, দ্বন্দ্ববহুল নাটকীয় চরিত্রের, যা নাট্যরসকে ঘনীভূত করে দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি 'ভিলেন' বা খলনায়কের চরিত্র, যা নাটককে আরও উপভোগ্য করে তোলে, সে রকম কোনো চরিত্র অনুপস্থিত। নায়িকার ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক স্থলেই প্রতিদ্বন্দ্বিনী বর্তমান, কিন্তু প্রথম দিকে তাঁদের উষ্মার প্রকাশ ঘটলেও অবশেষে ভাগ্যকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন (যেমন 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ধারিণী ও ইরাবতী, 'শকুন্তলায়' হংসপদিকা ইত্যাদি)। গ্রীক নাটকের মিডিয়া-জাতীয় চরিত্রে যে ধরনের চারিত্রিক প্রবলতার প্রকাশ বা শেক্সপীয়ারের চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ম্যাকবেথ-ওথেলো-ডেসডিমোনা-অফিলিয়ার মত মানবীয় রসে জারিত অথচ অনুভূতিকে জাগিয়ে দিতে সমর্থ এমন চরিত্রের অভাব আছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কালিদাসের নায়কেরা 'রাজা' ও 'বীরপুরুষ', নায়িকারা 'অর্ধেক মানবী অর্ধেক কল্পনা।' মাটির

পৃথিবীর সঙ্গে, সাধারণ জীবনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র সামান্যই। শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা—আশ্রমে ঋষি কণ্বের প্রতিপালিতা। উর্বশী তো নিজেই স্বর্গচ্যুতা অপ্সরা; আবার মালবিকাও রাজকন্যা ও রাজান্তঃপুরে আশ্রিতা; পরে রাজবধূ। অতএব ধূলামাটির মালিন্য তাঁদেয় গায়ে বিশেষ লাগেনি, বলাই বাহুল্য। যেহেতু বিভিন্ন প্রণয়ী-যুগলের রোমান্সই এইসব নাটকের প্রধান বর্ণনীয়, সেহেতু জীবনের আর সব বাস্তব দিক্ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় উপেক্ষিত। হয়তো নাট্যরচনা সম্বন্ধে প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলি কালিদাসের স্বেচ্ছা-বিকাশের অন্তরায় হয়েছিল। কিংবা 'ব্রাহ্মণ্যধর্মে অচঞ্চল নিষ্ঠা হেতু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, বিধাতার রাজ্যে অন্যায়-অত্যাচারের স্থান নেই, মানুষ আপনার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে, এইজন্য সংসারের বাস্তব ও রুদ্র মূর্তি তাঁর নাটকে নেই—মনীষী কীথের এই বক্তব্যও উপেক্ষণীয় নয়।

প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের নাট্যকারের মতই কালিদাস আগে কবি, পরে নাট্যকার। তাই দারুণ শোকের মুহূর্তেও নায়ক-নায়িকারা চমৎকার সুসংবদ্ধ উপমাদি-অলঙ্কারসমৃদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করে। এগুলি রাজসভার পোষকতায় রচিত কাব্যের কৃত্রিমতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। যদিও গ্রীক নাটক থেকে শেক্সপীয়ার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বহু পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সংলাপ লিখেছেন—তবু সেখানে নাট্যধর্ম বজায় আছে। কালিদাসেও নায়ক ও উচ্চকোটির মানুষেরা শ্লোক উচ্চারণ করেছেন—কিন্তু সেগুলি সাধারণতঃ তাঁদের মনের অবস্থা বা প্রাকৃতিক বর্ণনার প্রয়োজনে। অনেক স্থানে ঘটনার গতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অপ্রধান চরিত্রের কথোপকথনের মারফৎ 'প্রবেশক' বা 'বিষ্কম্ভকে'। সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে, নাট্য-শরীরের চেয়ে কাব্য-শরীরের প্রতি রচয়িতার বেশী মনোযোগ। সবকিছুই যেন সুমধুর পরিশীলিত কবিকর্ম।

কাহিনীসূত্রের জন্যে মহাভারত (শকুন্তলা) বা বৈদিক সাহিত্যের (বিক্রমোর্বশী) আশ্রয় নিলেও রচনাগুলিকে কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টিই বলা চলে। প্রাচীন ইউরোপীয় কবিরা কাহিনীর জন্যে হোমারের কাছে যতটা ঋণী কালিদাসের ঋণ সে তুলনায় যৎসামান্য। অনেক ক্ষেত্রে অতি-প্রাকৃত (supernatural) ঘটনা নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। যেমন, এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তির প্রভাবে শকুন্তলার রাজসভা থেকে অদৃশ্য হওয়া,

'বিক্রমোর্বশী'তে উর্বশীর কুমার-বনে প্রবেশ করে কার্তিকেয়ের অভিশাপে লতায় পরিণত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। গ্রীক নাটকের মতো প্রবলভাবে না হলেও নিয়তির লীলা যে কালিদাসেও বিদ্যমান তার প্রমাণ 'শকুন্তলায়' দুর্বাসার অভিশাপ ও তার ফলভোগ; 'বিক্রমনাটকে' উর্বশীর স্বর্গচ্যুতি; 'মালবিকায়' প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভাগ্যনির্দিষ্ট পতির সঙ্গে মিলন ইত্যাদি। মোটের ওপর, অনুভূতির গভীরতা, প্রকৃতির অনবদ্য বর্ণনা, মানব-মানবীর আবেগ-ভালবাসার সুষ্ঠু প্রকাশ, রমণীয় চিত্রকল্প ইত্যাদি প্রায় সর্বপ্রকার কাব্যগুণের সুসমন্বিত প্রকাশ তাঁকে কবি হিসাবে অবশ্যই শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছে। সুতরাং 'বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী কালিদাসং বরম্'—জাতীয় স্তুতিবাদগুলি অকারণ নয়। তাছাড়া, সেই যুগের প্রায় সকল শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি যে যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণও ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনাগুলিতে।

কালিদাসের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কিংবদন্তী তাঁর যুগ-যুগ-ব্যাপী জনপ্রিয়তার সূচক, যদিও সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যৎসামান্য। তাঁর আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কবি খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের পূর্বের লোক হতে পারেন না; যেহেতু 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র নায়ক অগ্নিমিত্র ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেনাপতি পুষ্যমিত্রের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) পুত্র। আবার খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরেও তাঁর আবির্ভাব হয়নি, তার প্রমাণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমেই (?) বাণভট্ট ও আইহোল লিপির (খৃঃ ৬৩৪) কবি কর্তৃক তিনি সগৌরবে কীর্তিত। ৪৭২ খৃষ্টাব্দের 'মান্দাসোর-লিপি' বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা আরও অনুমান করেন, কালিদাস এই লিপির পূর্ববর্তী। জনপ্রিয় মত হিসাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্নরূপেই কালিদাসের স্বীকৃতি। অতএব অধ্যাপক কীথের অনুসরণে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতককেই কালিদাসের কাল বলা যেতে পারে।[২৫]

শূদ্রক—'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক সম্বন্ধেও প্রায় কালিদাসের মতই বহুমুখী গবেষণা হয়েছে—যার ফলে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয়

---

২৫ ..."to trace him about A. D. 400 seems completely justified."
—Keith, History of Sanskrit Literature

ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়-সীমার মধ্যে পণ্ডিতরা তাঁকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর সময় নির্ণয়ের প্রয়াস হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে—(ক) কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে তাঁকে বিক্রমাদিত্যের পূর্ববর্তী বলা হয়েছে; (খ) স্কন্দ-পুরাণে অন্ধ্রবংশীয় নরপতিরূপে শূদ্রকের উল্লেখ রয়েছে; (গ) 'কথাসরিৎসাগর' ও ''বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে যথাক্রমে 'শোভাবতীর রাজা' ও 'বর্ধমানের রাজা' রূপে শূদ্রকের নাম পাওয়া যায়; (ঘ) বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে তাঁকে বিদিশাধিপতি বলা হয়েছে; আবার হর্ষচরিতে বর্ণিত আছে শূদ্রক কিভাবে চকোরের রাজকুমার চন্দ্রকেতুর শত্রুতা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। (ঙ) কালিদাসের পূর্বসূরি রামিল বা সোমিল যে 'শূদ্রককথা' লিখেছিলেন সে রকম উল্লেখও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এত সব তথ্য সহজেই প্রমাণ করে যে শূদ্রক নামে একজন সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। এইজন্যেই বোধহয় অধ্যাপক লেভির মত যে 'চারুদত্তে'র রচয়িতা পরে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি লিখে দূর অতীতের খ্যাত পুরুষ, শূদ্রকের নামটি বসিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এই মত বিশেষ সমর্থন লাভ করেনি। তিনি যে অষ্টম খৃষ্টাব্দের আগেই এই নাটক রচনা করেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন 'বামন' তাঁর কাব্যালঙ্কারে এই নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত করে। রাজশেখরও বলেছেন, প্রথমে ছিলেন তিনি সাতবাহন বা শালিবাহনের মন্ত্রী, পরে হলেন অর্ধেক রাজ্যের রাজা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অধ্যাপক স্টেনকোনো বলেছেন, আভীররাজ 'শিবদত্তই' শূদ্রক যিনি শেষ অন্ধ্রনরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে চেদিসংবৎ প্রতিষ্ঠা করেন।

Jacobi এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের জ্যোতিষ-সংক্রান্ত বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই নাটকের রচনাকাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বে হওয়া সম্ভব নয়। Jolly শূদ্রককে খৃঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে আনার পক্ষপাতী, কারণ নাটকে বর্ণিত বিচার-পদ্ধতি এই সময়েরই সাক্ষ্য দেয়। আবার নায়ক বণিক চারুদত্ত, নায়িকা গণিকা বসন্তসেনা, রাজশ্যালক শকার, বিট ইত্যাদি চরিত্র ও সামাজিক রীতিনীতি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র (খৃঃ পঞ্চম শতক) কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ করে পিশেল, ম্যাকডোনেল, মেহাণ্ডেল প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদেরা দণ্ডীর সম-

সাময়িক বলে ধরে নিয়ে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতককেই শূদ্রকের কাল বলে নির্দেশ করেছেন। এই সিদ্ধান্তই এখন পর্যন্ত সাধারণভাবে স্বীকৃত।

শূদ্রকের সবিশেষ পরিচয় সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকার বক্তব্যটিও উল্লেখ্য— অশ্মক দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণ শূদ্রক স্বাতী নামে রাজকুমারের বন্ধু ছিলেন। পরে কলহ হওয়ায় পালিয়ে যান। অবশেষে উজ্জয়িনী অধিকার করে তিনি রাজা হন। বেদ-বেদান্ত-গণিত-জ্যোতিষ নানাবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে, একশ' বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। সহজেই এই প্রশ্নগুলি দেখা দেয়—শূদ্রক কি একাধিক ব্যক্তির নাম ছিল। তাহলে কোন্ শূদ্রকের রচিত এই নাটক? অথবা এই নামের জনপ্রিয়তার জন্য এটি লেখকের ছদ্মনাম? এখনও এই প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু মীমাংসা হয়েছে—এমন কথা বলা চলে না।

যাই হোক্, দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে এই দশ অঙ্কের নাটক, আলঙ্কারিকদের পরিভাষায় 'প্রকরণ' মৃচ্ছকটিকের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের কথাবস্তুতে রাজরাজড়াদেরই প্রাধান্য দেখা যায়—কিন্তু এই নাটকটি তার ব্যতিক্রম। এটিকে সাধারণ মানুষের নাটক আখ্যা দিলে ভুল হবে না; কারণ নায়ক কপর্দকশূন্য বণিক্, নায়িকা গণিকা। লম্পট-জুয়াড়ী-তস্কর-ভৃত্য প্রমুখ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চরিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে এই নাটকে, এমন কি শকাররূপী খলনায়কও উপস্থিত। তাছাড়া, অত্যাচারী রাজা পালককে সিংহাসনচ্যুত করে সাধারণ গোয়ালার ছেলে আর্যকের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রাচীন রাষ্ট্রবিপ্লবের আদর্শকে তুলে ধরেছে। প্রকৃতপক্ষে এই নাটক তৎকালীন সমাজচিত্রের একটি অমূল্য দলিল। কালিদাস-ভবভূতির নাটকের মত এটি শুধু নাট্যকাব্য (Dramatic Poem) নয়—যথার্থ নাটকের প্রায় সমস্ত গুণে ভূষিত। উপসংহারে নগরনটী বসন্তসেনা 'বধূ' উপাধি লাভ করে চারুদত্তের সঙ্গে সমাজবিহিত মিলনের অনুমতি পেলেও অর্থাৎ নাটকটি মিলনান্তক হ'লেও শকারের বসন্তসেনাকে হত্যার চেষ্টা, চারু-দত্তের মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি ঘটনাগুলি নাটকোচিত সাস্পেন্স (Suspense) রক্ষা করে চলেছে। 'Most Shakespearian of Sanskrit Plays'— এই বিশেষণটি 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই সুপ্রযুক্ত।

ক্রন্দনরত চারুদত্তের পুত্রের খেলার জন্যে মাটির গাড়ীতে (মৃৎ+ শকটিকা) বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি সোনার গাড়ী গড়ানোর উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। মৃৎ শকটে অর্পিত এই স্বর্ণালঙ্কারই পরে নাটকটির গতি নিয়ন্ত্রিত করে। নাটকের নামকরণের মূলে এই ঘটনাটিরই প্রভাব আছে। তাছাড়া পরে শকটের পরিবর্তনের ফলে বসন্তসেনার শকারের কাছে প্রমোদোদ্যানে আগমন, বিদ্রোহী আর্যকের চারুদত্তের শকটের আশ্রয়ে পলায়ন ও আত্মরক্ষা—ইত্যাদি ব্যাপারগুলির মাধ্যমে নাটকীয় ঘটনার বিকাশ সাধিত হওয়ায় নাটকটিতে 'শকটে'র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলা চলে—'মৃচ্ছকটিক' এমন একটি ভিন্ন স্বাদের সংঘাতময় নাটক যা সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের গতানুগতিকতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত।

ভবভূতি—কালিদাসোত্তর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ভবভূতির রচনাগুলিতে তাঁর নিজের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য স্থান পেয়েছে। উদুম্বর উপাধিধারী কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। 'মালতীমাধবে'র একখানি পুঁথিতে তিনি কুমারিলশিষ্য ঔম্বেকাচার্যরূপে অভিহিত। কিন্তু অন্য কোথাও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। তাঁর পিতামহ ছিলেন ভট্টগোপাল ও পিতামাতা যথাক্রমে নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণী। বিদর্ভের[২৬] অন্তর্গত পদ্মপুর ছিল তাঁদের বাসস্থান। ভবভূতি বেদজ্ঞ ছিলেন এবং সাংখ্য ও যোগদর্শনেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজশেখরের বালরামায়ণে[২৭], বামনের কাব্যালঙ্কারে[২৮] ও বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহে' তাঁর প্রশংসা দেখা যায়। কল্‌হণের রাজ-তরঙ্গিণীতে[২৯] উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি প্রথমে কনৌজরাজ যশোবর্মণের সভাকবি ছিলেন। এই সমস্ত প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে খৃঃ সপ্তম শতকের শেষ অথবা অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে ভবভূতি কাব্যরচনা করেছিলেন।

ভবভূতি-রচিত তিনখানি নাটকের ('মহাবীরচরিতম্', 'উত্তররামচরিতম্', 'মালতীমাধবম্') প্রথম দু'খানি সপ্তাঙ্ক ; বলা বাহুল্য, এই দু'খানি নাটকের কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত। রাম-কাহিনীর প্রথমাংশ প্রথম নাটকের

২৬ বর্তমান বেরার

২৭ বালরামায়ণ—১-১৬

২৮ কাব্যালঙ্কার ১—২, ১২ ; ৪—৩, ৬

২৯ রাজতরঙ্গিণী—৪—১৪-৪

ও সীতা-বিসর্জন, লবকুশের জন্ম, পরিশেষে রামসীতার পুনর্মিলন দ্বিতীয় নাটকটির বিষয়বস্তু। সঙ্গত কারণেই মূল কাহিনীর চেয়ে কবির নিজস্ব কল্পনাই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। উজ্জয়িনীর মন্ত্রিকন্যা মালতী ও শিক্ষার্থী মাধবের প্রণয়-কাহিনী তৃতীয় নাটকটির উপজীব্য। মকরন্দ-মদয়ন্তিকার পার্শ্ব-কাহিনী নাটকটিকে একদিকে যেমন উপভোগ্য করে তুলেছে, অন্যদিকে আবার তার প্লট বা আখ্যানভাগকে জটিল করে তুলেছে—'সুকুটিলমিতিবৃত্তং মালতীমাধবস্য'।

ভবভূতির সর্বোত্তম সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে উত্তররামচরিতের দাবীই সর্বাগ্রে। মূল রামায়ণকে কয়েকটি বিষয়ে অতিক্রম করে নিজের কল্পনাকেই কবি বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। রামের চরিত্র- চিত্রণে, ছায়াসীতার প্রসঙ্গে, এমন কি উপসংহারে বাল্মীকি রামায়ণের বিয়োগান্তক বর্ণনার পরিবর্তে রামসীতার মিলন ঘটিয়ে ভবভূতি নাটকটির মৌলিকত্ব বজায় রেখেছেন। 'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে'—এই উক্তিটি উত্তররামচরিতের ঘনীভূত করুণ রসের বর্ণনায় সার্থক। প্রকৃতির বর্ণনাও তাঁর লেখনীস্পর্শে চিত্রের মতই মনোজ্ঞ, অনুভূতির রসে জারিত হয়ে উঠেছে। সীতার বা মালতীর রূপবর্ণনায়, দণ্ডকারণ্য-পঞ্চবটী শ্রীপর্বতের বর্ণনায় তাঁর কাব্যদক্ষতা স্বতঃই উৎসারিত। বলা বাহুল্য, তিনিও কালিদাসের মতই নাট্যকর্মের চেয়ে কবিধর্মের প্রতিই অধিক মনোযোগী। ভবভূতির কাব্য যে সমকালে প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, তা বোঝা যায় যখন তিনি জোর গলায় বলেন—এই অনন্ত কালও বিপুলা পৃথিবীতে অবশ্যই একদিন তাঁর কাব্যের রসগ্রাহী পাঠক জন্মাবেন।[৩০] অসামান্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি বলেছিলেন—'বাগ্‌দেবী আজ্ঞানুবর্তিনী সেবিকার ন্যায় যে ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে থাকেন তাঁরই প্রণীত 'উত্তররামচরিত'।[৩১] তাঁর এই বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি।

শ্রীহর্ষ : 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ'—এই তিনটি নাটকের রচয়িতা 'শ্রীহর্ষ' নিজেই এক ঐতিহাসিক চরিত্র। একাধিক প্রাচ্যবিদ্ স্বীকার করেছেন যে ইনি স্থানীশ্বররাজ হর্ষবর্ধন (খৃঃ ৬০৬—৬৪৮)। রচনার

৩০ "...উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

—মালতীমাধব, প্রস্তাবনা

৩১ "যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ততে"। —উঃ চরিত।

কলোফনেও (colophon) হর্ষেরই নাম পাওয়া যায়। তাঁরই সভাকবি 'বাণভট্ট' হর্ষের কাব্যশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগ হর্ষের রাজত্বকাল বলে যে মত প্রকাশ করেছেন তা' মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। ঐ তিনখানি নাটকেরই রচয়িতা যে একই ব্যক্তি এ বিষয়েও মতভেদ নেই। সপ্তম খৃষ্টাব্দেই ইৎ-সিং বলেছেন —'নাগানন্দ' নাটক হর্ষের রচনা। নবম শতকে দামোদর গুপ্ত তাঁর 'কুট্টনীমতম্' গ্রন্থে হর্ষের লেখা নাটিকা 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 'উদয়সুন্দরীকথা' কাব্যে হর্ষকে 'কবীন্দ্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত প্রমাণ নিশ্চয় হর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত এই মতবাদের খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট যে তিনি সভাকবিকে দিয়ে কাব্য লিখিয়ে নিজের নামে প্রচার করেছিলেন।

তিনটি নাটকের মধ্যে 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা'র বিষয়বস্তু প্রায় একই; শুধু নায়িকা ও কয়েকটি পাত্রপাত্রীর নামেই যা প্রভেদ। প্রাচীন বহু উপকথার রোমান্টিক নায়ক 'উদয়ন' এই দু'টি নাটকেরও মুখ্যচরিত্র। নায়িকা প্রথমটিতে 'রত্নাবলী' ওরফে 'সাগরিকা', দ্বিতীয়টিতে 'প্রিয়দর্শিকা' ওরফে 'আরণ্যকা'। এই নাটকদ্বয়ের আখ্যানবস্তুতে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র প্রভাব লক্ষণীয়। যদিও 'রত্নাবলী' নাটকটিই শ্রীহর্ষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তবুও বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে তৃতীয় নাটক 'নাগানন্দ'ই কিছু অভিনবত্বের দাবী রাখে। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের নায়ক বিদ্যাধররাজ জীমূত-বাহন মা-বাবার সেবার জন্য বনে আসেন। বিশ্বপ্রেমই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাই নাগরাজের সঙ্গে গরুড়ের চুক্তির কথা জেনে বধ্যশিলায় সর্পের প্রতিনিধিরূপে নিজেকেই গরুড়ের ভক্ষ্য হিসাবে উৎসর্গ করেন। গরুড় পরে নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়। গৌরীদেবীর আশীর্বাদে জীমূতবাহন আবার নবকলেবর প্রাপ্ত হন। গন্ধর্বরাজকন্যা মলয়বতীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের কাহিনীও প্রথম তিন অঙ্কে এই নাটকে সংযুক্ত হয়েছে। প্রথমদিকে বুদ্ধের স্তুতি স্থান পেলেও নাটক শেষ হয়েছে গৌরীদেবীর অবতারণায়। অতএব বৌদ্ধ প্রভাবের সঙ্গে হিন্দুমতবাদেরও মিশ্রণ ঘটেছে। 'কথাসরিৎসাগর' ও 'বৃহৎকথামঞ্জরী'—এই দু'টি গ্রন্থেই জীমূতবাহনের কাহিনী আছে—নাটকের আখ্যানবস্তু ঐ উৎস থেকেই গৃহীত। বলা বাহুল্য, নাট্যকাব্য

রচনায় ভাসকালিদাস প্রভৃতি পূর্বস্থরিদের প্রভাবমুক্ত না হলেও শ্রীহর্ষ অনেকক্ষেত্রে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মুদ্রারাক্ষস ঃ সংস্কৃতসাহিত্যের জগতে একাধিক কারণে স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের দাবী রাখে বিশাখদত্ত বিরচিত মুদ্রারাক্ষস। স্ত্রীভূমিকাহীন এই নাটকে প্রেমকাহিনীর গতানুগতিকতা সম্পূর্ণ বর্জিত। শুধুমাত্র রাজনৈতিক জটিলতাকে উপজীব্য করে নাট্যরচনার প্রয়াস এই প্রথম বলা চলে। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য ও নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস—এই দু'জনের বুদ্ধির দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করেই নাট্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। কূটবুদ্ধিতে অবশ্য জয় হয়েছে চাণক্যেরই। রাক্ষসের নামমুদ্রা (শীলমোহর) সংগ্রহের পর কৌশল করে তাঁকে দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করানোর পর চাণক্যের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। 'মুদ্রারাক্ষস' নামটিরও সার্থকতা এখানেই। চন্দ্রগুপ্তের হত্যার জন্যে রাক্ষসের বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ার ঘটনাগুলি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি চাণক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, রাক্ষস প্রভৃতি চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও রচয়িতা অন্ধভাবে ইতিহাসের অনুসরণ করেন নি, বরং বহুক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতাই নাটকটিকে প্রাণবান্ করে তুলেছে। 'মাধুর্যগুণ' বা রসসৃষ্টির বাহুল্য না থাকায় এই নাটকের আবেদন মুখ্যতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য। এইভাবে একটি ভিন্নধরনের নাটক হিসাবে সংস্কৃত কাব্যরসিকদের কাছে 'মুদ্রারাক্ষসের' একটি স্বতন্ত্র মূল্য বর্তমান।

বিশাখদত্তের যুগ ও পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া গেলেও নাটকের 'ভরতবাক্য' আলোচনা করে উইলসন, জ্যাকোবি, স্টেনকোনো প্রমুখ মনীষীরা যে আলো দেখিয়েছেন তার অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই। নাট্যকার নিজের পরিচয় দিয়েছেন মহারাজ উপাধিধারী পৃথুর পুত্র ও সামন্তনৃপতি বটেশ্বর দত্তের পৌত্ররূপে। কোনো ভরতবাক্যে রাজা চন্দ্রগুপ্তের নাম, কোনো কোনো পুঁথিতে অবন্তিবর্মা, রন্তিবর্মা বা দন্তিবর্মার নাম পাওয়া যায়। অবশ্য 'অবন্তিবর্মা' নামটি একাধিক রাজা ব্যবহার করেছেন—যেমন কাশ্মীর-রাজ, মৌখরী রাজ (যাঁর পুত্র গ্রহবর্মা হর্ষের ভগিনী রাজ্যশ্রীর স্বামী) প্রভৃতি। এই শেষোক্ত তথ্য গ্রহণ করলে তাঁকে পঞ্চম শতকের পরে স্থান দিতে হয়। এই মতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য

পণ্ডিতেরা মনে করেন—'ম্লেচ্ছৈরুদ্বেজ্যমানা' ভরতবাক্যের এই কথাটিতে খৃঃ অষ্টম শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে। উইলসন বলেন—ম্লেচ্ছ শব্দটি এখানে পাঠান রাজাদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নানাদিক্ বিবেচনা করে কীথ্ অনুমান করেন—বিশাখদত্ত খৃঃ নবম শতকের পূর্ববর্তী। আবার নাটকে বর্ণিত রাজধানী পাটলিপুত্র তথা কুসুমপুরের অবস্থা রাজ্যের সমৃদ্ধির সূচক, যা ফা-হিয়ানের বিবরণীতেও সমর্থিত। আবার ঘটনার প্রধানপুরুষ যেহেতু চাণক্য ও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত সেহেতু নাটকটি নিশ্চয় এদের পরবর্তী কালে রচিত। এই ধরনের নানা আলোচনার পর কৃষ্ণমাচারী পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দকেই[৩২] এই নাটকের রচনাকাল বলে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে।

অন্যান্য নাটক ও নাট্যকার—'ভট্টনারায়ণ' সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আরেকটি বিশ্রুত নাম। ছয় অঙ্কের নাটক 'বেণীসংহার' রচনার জন্যেই এঁর যেটুকু খ্যাতি। মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা বীররসপ্রধান এই নাটকের ওজস্বিতাই এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কেশাকর্ষণের অপরাধে দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের মধ্য দিয়ে ভীমের প্রতিজ্ঞারক্ষাই এখানে নাট্যবস্তু। দুঃশাসনের নিধন, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ-মহাভারতের এই ঘটনাগুলিই নাট্যকাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। ভট্টনারায়ণ ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী—একথা নিশ্চয় করে বলা চলে; কেন না বামন[৩৩] ও আনন্দবর্ধন[৩৪] তাঁদের অলঙ্কার-গ্রন্থে এই নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের আমন্ত্রিত কনৌজ থেকে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম।

রাজশেখরের রচনা হিসাবে চারটি নাটক পাওয়া যায়—'বালরামায়ণ', 'বালভারত', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' ও 'কর্পূরমঞ্জরী'। ইনি অবশ্য নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীরব নন। দুর্দ্দক ও শীলবতীর পুত্র রাজশেখর রাজা মহেন্দ্র-পালের গুরু ও তাঁর পুত্র মহীপালের পৃষ্ঠপোষিত কবিরূপে আত্মপরিচয়দান করেছেন। মহারাষ্ট্র ছিল তাঁর বাসভূমি। বাক্‌পতিরাজ, ভবভূতি, উদ্‌ভট

৩২ History of Classical Sanskrit Literature—Krishnamacharya.

৩৩ বেণী সং ৫, ২৬, (উদ্ধৃত—কাব্যালঙ্কার ৪, ৩-২৮ এ)

৩৪ ঐ ১, ২১ ; ৩, ৩১ (,,—ধ্বন্যালোক ২, ১০ এ)

ও আনন্দবর্ধনের উল্লেখ আছে তাঁর গ্রন্থে। এইসব তথ্য অনুসন্ধানের পর দশম খ্রীষ্টাব্দকে তাঁর সময় হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম দু'টি নাটকের বিষয়বস্তু যে রামায়ণ-মহাভারত থেকে গৃহীত—ঐ দু'টি গ্রন্থের শিরোনামই তার প্রমাণ। 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকের কাহিনী গতানুগতিক—এক রাজা ও এক রাজকুমারীর প্রণয়-ফলে রাণীর ক্রোধ, নায়ক-নায়িকার গোপন সাক্ষাৎ, বিচ্ছেদ-দুঃখ—পরিশেষে মিলন। নায়িকার নাম অনুসারেই এই নাটকের নামকরণ। অবশিষ্ট নাটকটিতেও রাজা বিদ্যাধরমল্ল ও লাটদেশের কন্যা মৃগাঙ্কাবলীর প্রেমোপাখ্যান চিরাচরিত প্রথায় গ্রথিত। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নায়িকার পুরুষের ছদ্মবেশে অবস্থান, বিদূষক ও রাণীর পালিত বোন মেখলার কার্যকলাপ বিভিন্ন কৌতুককর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ভবভূতির পরবর্তী নাট্যকারদের রচনাকে অনেকেই ক্ষয়িষ্ণু নাটকের পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষপাতী; কারণ এ যুগে নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে শৃঙ্খলিত ও পূর্বসূরিদের অনুকরণে লিখিত কৃত্রিম কাব্যবন্ধযুক্ত সৃষ্টিগুলিতে অন্যান্য গুণ কিছু থাকলেও মৌলিকতার ছিল নিতান্তই অভাব। কাজেই বিদগ্ধজনেরা যে এগুলিকে উচ্চমূল্য দেবেন না তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু এই একঘেয়েমির মধ্যেও দু'একটি রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যেমন কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ও মুরারির 'অনর্ঘরাঘব'। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে পাত্রপাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ পাপ-ধর্ম-যুক্তি-ভক্তি-বিবেক ইত্যাদি চারিত্রিক দোষগুণগুলি। ভারতীয় সাহিত্যে রূপক নাটকের এই বোধহয় প্রথম উদাহরণ। (পরবর্তী কালে বাংলাযাত্রা গানে বিবেকের ভূমিকা লক্ষণীয়।) নাট্যকার এখানে শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদ' প্রচারের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। রাজা কীর্তিবর্মার সমসাময়িক হিসাবে একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগেই কৃষ্ণমিশ্রের আবির্ভাব বলে অনুমান করা হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা 'মুরারি'র সপ্তাঙ্ক নাটক 'অনর্ঘরাঘবে'র রচনা কিন্তু আরও পূর্বে—খৃঃ অষ্টম-নবম শতকে। এই দু'খানি নাটক ছাড়া বিদর্ভ-দেশবাসী জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' যথেষ্ট প্রাচীন না হলেও এখানেও কাহিনীর জন্যে সেই রামায়ণের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। অনেকে বলেন, নৈয়ায়িক পক্ষধর ও জয়দেব একই ব্যক্তি। উত্তর ভারতের অধিবাসী ও শিবের

উপাসকরূপে এই জয়দেবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালী কবি জয়দেব এই নাটকের রচয়িতা নন। ক্ষেমীশ্বর (চণ্ডকৌশিক), বিহ্লন (কর্ণসুন্দরী), কবিকর্ণপূর (চৈতন্যচন্দ্রোদয়) প্রমুখ আরও বহু সংস্কৃত নাট্যকারের রচনা পাওয়া যায় ; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বিচরণ প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক পথে। স্বকীয়তার দ্যুতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অলমতিবিস্তরেণ।

স্বপ্নবাসবদত্তম্

"সরে যাও, সরে যাও, পথ ছাড় সকলে ; রাজকন্যা পদ্মাবতী আসছেন"—রক্ষীদের আদেশবাণীতে মুখরিত হয়ে উঠলো মগধরাজ্যের উপান্তস্থ তপোবনের শান্ত পরিবেশ। মাতৃসন্দর্শনের পর সেই তপোবনে রাত্রি যাপন করবেন মগধ রাজকন্যা পদ্মাবতী ; তাই রক্ষীদলের এই উৎসারণা। অবশেষে সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন সখী পরিবৃতা পদ্মাবতী—কৈশোর সবে বিদায় নিয়েছে—যৌবনের ঐশ্বর্যময় জগতে প্রবেশের দ্বারটি উন্মুক্ত হয়েছে তাঁর সামনে—অথচ কুমারীর সারল্য ও সৌকুমার্য তাঁকে ঘিরে রচনা করেছে এক নিষ্পাপ লাবণ্যময় পরিমণ্ডল। তাঁর আবির্ভাবে আশ্রম প্রকৃতি যেন প্রাণবান হয়ে উঠলো। রাজ অন্তঃপুররক্ষী ঘোষণা করে—"পুণ্যশীলা রাজকুমারী প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণে অভিলাষিণী। নিঃসঙ্কোচে তাঁর কাছে যাচ্ঞা করা যাবে যে-কোন প্রার্থিত বস্তু।" ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতই এগিয়ে এলেন প্রার্থিরূপে সন্ন্যাসী-বেশী এক ব্রাহ্মণ, সঙ্গে এক নারী। ব্রাহ্মণ পরিচয় দিলেন,—এই নারী তাঁর প্রোষিতভর্তৃকা ভগিনী আবন্তিকা। তাঁর প্রার্থনা—এই ভগিনীকে কিছুকাল পদ্মাবতীর আশ্রয়ে রক্ষা করা। কিন্তু আবন্তিকা কি সাধারণ নারী ? ভূষণহীনতা তো তাঁর সৌন্দর্যের দীপ্তিকে বিন্দুমাত্রও ম্লান করতে পারেনি ! আভিজাত্যের সমস্ত লক্ষণই যে তাঁর অঙ্গে প্রকাশিত। এই বুদ্ধিদীপ্ত সন্ন্যাসীই বা কে ? কিন্তু পরিচয় স্বয়ং প্রকাশ না করলে কৌতূহল অশোভন ; আবার প্রতিজ্ঞাও অবশ্য পালনীয় অতএব পদ্মাবতী অজ্ঞাত পরিচয় এই নারীকে স্থান দিলেন নিজের অন্তরঙ্গ সখীর দলে। এমন সময় বৎসরাজ্যের লাবাণক গ্রাম থেকে এক ব্রহ্মচারী উপস্থিত সেই তপোবনে, সকলের কাছে সে প্রকাশ করে এক নিদারুণ সংবাদ—

লাবাণক গ্রাম অগ্নিদগ্ধ, বৎসরাজ উদয়ন ও রাজ্ঞী বাসবদত্তা তখন সেই গ্রামেই বাস করছিলেন—রাজা উদয়ন গিয়েছিলেন মৃগয়ায়—কিন্তু বাসবদত্তা ছিলেন প্রাসাদে। সোনার প্রতিমা বাসবদত্তা, রাজা উদয়নের হৃদয় মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসবদত্তা—স্বামীর সহধর্মিণী পতিগতপ্রাণা বাসবদত্তা। হুতাশনের ক্রোধবহ্নি বুঝি তাঁকেও নিষ্কৃতি দিল না! লাবাণক গ্রাম ভস্মস্তূপ, অধিবাসীরা আশ্রয়ের সন্ধানে ইতস্তত পলায়িত। মৃগয়া প্রত্যাগত রাজা উদয়ন এ দৃশ্য দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না, বাসবদত্তাহীন জগৎ তাঁর কাছে শূন্য ; দুঃখের কঠিন আঘাতে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন তিনি।

মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্রহ্মচারী বিবৃত করে চলে রাজা উদয়নের শোকের আকুলতার কথা। 'চক্রবাক-চক্রবাকী'র বিচ্ছেদে আছে গভীর বেদনা ; কিন্তু উদয়নের বিরহ-দুঃখের কাছে সে বিচ্ছেদ বুঝি কিছুই নয় ; ধূলিবিলুণ্ঠিত রাজা শুধু সর্বদাই বিলাপ করে চলেছেন—'হা বাসবদত্তা, হা অবন্তীরাজপুত্রী'—অশ্রুবাষ্পে তাঁর নয়ন অন্ধ।—মৃত্যুই যেন আজ তাঁর কাছে শ্রেয়।—শুধুমাত্র মন্ত্রী রুমণ্বানের সযত্ন পরিচর্যার ফলেই তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়নি এখনও। এই করুণ কাহিনী শ্রোতাদের চোখকেও অশ্রুসজল করে তোলে। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত, অতএব সেদিনের মত বিদায় নিলেন সকলে, আবন্তিকা গচ্ছিত রইলেন পদ্মাবতীর আশ্রয়ে।

দিনের পর দিন যায়, বেশ কিছুকাল পরে উদয়ন এসেছেন কার্য উপলক্ষে পদ্মাবতীর ভ্রাতার রাজ্য মগধে। বৎসরাজ উদয়নের বিদ্যা-বিত্ত-কুলশীলে মুগ্ধ মগধরাজ ভগিনী পদ্মাবতীকে তাঁর হস্তে সমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৎসরাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন মগধরাজের সাহায্যের। অতএব তাঁর ইচ্ছার অবমাননা করা উদয়নের পক্ষে সমীচীন হবে না কোন মতেই। বাধ্য হয়ে রাজী হন উদয়ন। পরদিনই শুভলগ্ন—অতএব 'শুভস্যশীঘ্রম্'। পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ যেন বেশ সহসাই ঘটে গেল—

বিশেষ চিন্তারও অবকাশ পেলেন না তিনি। আর আবন্তিকা ? সমস্ত অন্তঃপুর যখন বিবাহের প্রমোদে মত্ত, তিনি কেন অন্তঃপুরের উদ্যানে অশ্রুপাত করে চলেছেন !—চক্রবাকী, যে প্রিয় বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ করে, তার ভাগ্যকে ঈর্ষা করে বিলাপ করছেন কেন ? তিনি যেন সর্বহারা ; 'অজ্জউত্তো বি পরকীয়ো সংবুত্তো'—আর্যপুত্রও আজ অপরের হলেন—এই খেদোক্তি কার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ?

বিবাহের পর উদয়ন কিছুদিন কাটালেন মগধের রাজঅন্তঃপুরে। একদিন সসখী পদ্মাবতী আবন্তিকাকে নিয়ে উদ্যানবিহারে এসেছেন, শরতের প্রভাতে পুষ্পময় উদ্যানের কি অপূর্বশোভা ! নির্জল আকাশ সদ্যোস্নাত নীল অঙ্গে জড়িয়েছে শুভ্রমেঘের কাঁচলী ; শঙ্খধবল বকের সারি যেন তার কণ্ঠে মুক্তাহার। অজস্র শেফালিকার সমারোহ যেন নব দম্পতীর প্রতি উদ্যান প্রকৃতির আশীর্বাদের বার্তাবহ ! মাঝে মাঝে বিশাল বনস্পতি রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে কাননে প্রহরারত—তাদের নীচে শিলামণ্ডপগুলিতে অতিথির অভ্যর্থনার ইঙ্গিত ; কয়েকটি লতাবিতানের ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশ ভ্রমণক্লান্তকে জানায় বিশ্রামের আমন্ত্রণ। বিদূষকসহ উদয়নকে সেই উদ্যানে আসতে দেখেই প্রমীলাকুল লতাবিতানে আত্মগোপন করলেন। ছায়াঘন আশ্রয়ের সন্ধানে রাজা বিদূষককে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন সেই দিকে—সমূহ বিপদ, এই বুঝি সব গোপনতার অবসান হলো। সহসা এক সখী অন্তরাল থেকে মধুকরসঙ্কুল লতা আন্দোলিত করায় দংশন ভয়ে ভীত হয়ে বিদূষক রাজার গতি রোধ করল ; নিরুপায় রাজা সেই লতামণ্ডপেরই কাছে শিলাতলে বসলেন, বিদূষক প্রশ্ন করেন—"কা ভবদো পিয়া—তত্তহোদী বাসবদত্তা ইদানীং পদুমাবতী বা" ? কে আপনার প্রিয়তমা—সেই বাসবদত্তা, না এই পদ্মাবতী ? বিদূষকের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই রাজা প্রকাশ করলেন—'পদ্মাবতী বহুমতা যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈ বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু

তাবন্মে মনোহরতি।' রূপে ও চরিত্রমাধুর্যে পদ্মাবতী যদিও আদরণীয়া তবু বাসবদত্তায় আকৃষ্ট চিত্ত তাঁর আজিও অবিচল। কিন্তু উদয়নের এই উক্তি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে আবন্তিকার নয়নকে কেন বাষ্পাকুল করে তোলে? কে এই ছদ্মবেশিনী নারী?

বাসবদত্তার প্রসঙ্গ রাজার চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে—অশ্রুজল বিসর্জনে সেই পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করেন তিনি। তাঁর মুখ প্রক্ষালনের জন্যে জল আনতে গেলেন বিদূষক। রাজার দৃষ্টিও বাষ্পাচ্ছন্ন। এই সুযোগে আবন্তিকা পদ্মাবতীকে স্বামীর কাছে রেখে দ্রুতপদে বিদায় নিলেন। বিদূষক জল আনলে পদ্মাবতী বিস্ময়ের ভান করে জিজ্ঞাসা করলেন—এই জলের কি প্রয়োজন? ধূর্ত বিদূষক প্রকৃত কারণ গোপন করে বলে—কাশফুলের রেণুতে রাজার চক্ষু আবিল হওয়ায় দৃষ্টিকে নির্মল করার প্রয়োজনেই জল আনা হয়েছে। ব্যথা পাছে লাগে পদ্মাবতীর, তাই এই মিথ্যা ভাষণ বিদূষকের। রাজাও তার দুঃখের কারণ গোপন রাখতে চান পদ্মাবতীর কাছ থেকে। এইভাবে হৃদয়ের অদৃশ্য ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ে উদয়নের। কিন্তু কোনদিন কি এই ক্ষতের নিরাময় হবে না বাসবদত্তার প্রেমকোমল স্পর্শে?

একদিন পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন—সমুদ্রগৃহে রচিত হয়েছে তাঁর শয্যা। সংবাদ পেয়ে উদয়ন এলেন কুশল কামনা জানানোর জন্যে। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এসেছে চারিদিকে—মৃদুদীপালোক কক্ষের অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি। রোগশয্যা তখনও শূন্য। কর্মক্লান্ত উদয়ন পদ্মাবতীর প্রতীক্ষায় থেকে সেই শয্যাতেই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবন্তিকা পীড়িত পদ্মাবতীর পরিচর্যার জন্য প্রবেশ করেন সেই কক্ষে। আলো আঁধারের মায়া সৃষ্টি করেছে এক রহস্য-লোক। শয্যায় শায়িত কে একজন! নিশ্চয়ই পদ্মাবতী ব্যতীত আর কেউ নয়! এগিয়ে এসে আবন্তিকা উপবেশন করেন শয্যার একাংশে। 'এ কি'! চমকে

ওঠেন আবন্তিকা, 'এ তো পদ্মাবতী নয়, এ যে স্বয়ং উদয়ন!' কিন্তু আবন্তিকা কিসের আকর্ষণে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকেন নিদ্রিত উদয়নের মুখ পানে—যেন কোন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়ের স্বাক্ষর সেই মুখে! নিদ্রিত উদয়ন স্বপ্নেও বাসবদত্তার নাম ধরে বিলাপ করেন—আবন্তিকাবেশধারিণী মোহাবিষ্টের মত উত্তর দিয়ে চলেন তাঁর নিদ্রা-প্রলাপের। হঠাৎ উদয়নের তন্দ্রা যায় ভেঙে—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবন্তিকা সবেগে স্থান ত্যাগ করলেন।—রাজাও ধাবমান সেই পলাতক ছায়ার সন্ধানে!—কিন্তু গতি রুদ্ধ হলো প্রায়ান্ধকার কক্ষের দ্বারে বাধা পেয়ে। দেখা দিল সংশয়—'ও কি মায়া কিংবা স্বপন কায়া!' বাসবদত্তা কি সত্যিই বিদেহী? তা হলে কার স্পর্শের শিহরণ এখনও তাঁর দেহে—বাক্যবিনিময়ই বা হলো কার সঙ্গে! বিদূষক এসে সব শুনে মন্তব্য করে—'এ নিশ্চয় স্বপ্ন।' কিন্তু রাজার অন্তর তো এত সহজে সায় দিতে চায় না—সংশয়াকুল চিত্তেই তিনি মন্তব্য করেন—'এ যদি স্বপ্ন হয়, তবে আমার নিদ্রাই ভাল—আর যদি ভ্রম হয় তাহলে সে ভ্রমই হোক চিরস্থায়ী।' 'যদি তবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্। অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমোহস্তু মে চিরম্।'

বাসবদত্তা শুধু পত্নীই নন, তিনি ছিলেন উদয়নের প্রিয়শিষ্যা। সুবাদক রাজা অবসর মুহূর্তে বাসবদত্তাকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতেন। তাঁদের বহু নিভৃত সান্নিধ্যের সাক্ষী সেই ঘোষবতী বীণা অগ্নিদগ্ধ লাবাণক গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হোল একদিন; দগ্ধপ্রায় সেই বীণা রাজার মনকে আকুল করে তোলে। বাসবদত্তার জন্য উদয়নের বিলাপের মুহূর্তে প্রতিহারী জানায় বাসবদত্তার পিতামাতার প্রেরিত কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রী অঙ্গারবতী এসেছেন অবন্তীরাজ্য থেকে। পদ্মাবতী সহ সাক্ষাৎ করেন রাজা উদয়ন এঁদের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে এনেছেন উদয়ন ও বাসবদত্তার চিত্রফলক। পদ্মাবতীর কৌতূহলে বাসবদত্তার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হলো—'এ কি'! চমকিতা কেন পদ্মাবতী!

বাসবদত্তার চিত্রের সঙ্গে কার সাদৃশ্য তাঁকে বিস্মিত করে তোলে? অঙ্কনে কি তবে কোনো ত্রুটি আছে? না তো! নিঃসন্দেহ হন পদ্মাবতী উদয়নের ছবি দেখে—নিপুণ শিল্পী যথাযথভাবেই উদয়নকে তাঁর তুলিকায় ধরে রেখেছেন। চুপিচুপি পদ্মাবতী কি যেন বলেন উদয়নকে; উদয়নও স্বীকৃতির ইঙ্গিত দেন। অন্তঃপুর থেকে প্রোষিতভর্তৃকা ছদ্মবেশিণী আবন্তিকাকে আনা হলো—রাজার আদেশে পদ্মাবতী তাঁর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলেন। বিস্মিত রাজা দেখেন—এই নারীই তো তাঁর প্রিয়তমা পত্নী বাসবদত্তা। স্বপ্নাবিষ্ট রাজার দেহে তবে এরই স্পর্শে রোমাঞ্চ জেগেছিল! কিন্তু কেন এই গোপনতা, এই লুকোচুরি!

এই সময় প্রবেশ করে রাজাকে অভিবাদন জানায় দীপ্তদেহ সেই সন্ন্যাসী, যে পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তাকে ন্যস্ত রেখেছিল। কণ্ঠস্বরে তাঁর পরিচয় উদয়নের কাছে গোপন থাকে না—'অয়ে! অসৌ যৌগন্ধরায়ণঃ! আরে, এ যে যৌগন্ধরায়ণ! কিন্তু বাসবদত্তাকে কৌশলে অপসারিত করে পদ্মাবতীর কাছে রাখার কারণ কি?

সব সমস্যার সমাধান হলো। রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রাজ্ঞ মন্ত্রী জানালেন—বৎসরাজ্য রক্ষাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজ্য সম্পূর্ণভাবে শত্রুকবলমুক্ত করতে গেলে প্রয়োজন মগধরাজের সহায়তা, সে উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে পদ্মাবতীকে বিবাহ করে মগধ রাজের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়লে। কিন্তু বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের প্রেম সুগভীর—দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে তাঁকে রাজী করান প্রায় অসম্ভব। তাই লাবাণক দাহের পরিকল্পনা ও বাসবদত্তার মৃত্যু সংবাদ রটনা। রাজজ্যোতিষীদের সিদ্ধান্ত ও বাসবদত্তার অনুমতি অনুসারেই তাঁর এই চক্রান্ত। উদ্দেশ্য আজ তাঁর সিদ্ধ হয়েছে। রাজ্য আজ শত্রুকবলমুক্ত। তিনিও ক্ষমাপ্রার্থী এই ছলনার জন্য। আবেগে উদয়নের কণ্ঠরুদ্ধ—আবার ফিরে পেয়েছেন তিনি বাসবদত্তাকে।

বিরহের দুঃখ দহন তাঁর প্রেমকে করে তুলেছে আরও গভীর, আরও ভাস্বর! বাসবদত্তারও সব কষ্টের অবসান হলো—মধুর মিলন টেনে দিল নাটকের যবনিকা; সত্য হলো—প্রথম অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণের উক্তি—'চক্রারপংক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপংক্তিঃ—দুর্দিন আর সুদিন—এ দুয়ের ক্রমাবর্তন জগতে চিরন্তন'।

অবিমারক

রাজা কুন্তিভোজ একমাত্র কন্যা কুরংগীর বিবাহের চিন্তায় বিব্রত। যদিও রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করে কাশীরাজ্য থেকে দূত উপস্থিত তবুও কি এক অনিশ্চয়তায় কুন্তিভোজের অন্তর শঙ্কাকুল—'বিবাহা নাম বহুশঃ পরীক্ষ্যাৎ কর্তব্যা ভবন্তি।' বিবাহের মত ব্যাপারে তো সত্যিই অনেক কিছু চিন্তার আছে!

রাজকন্যা গেছেন উপবন বিহারে—হঠাৎ শোনা গেল কোলাহল ও আর্তনাদ! শঙ্কিত হয়ে ওঠেন রাজারানী—রাজকন্যার কোনো বিপদ ঘটে নি তো? এত ত্রস্তভাবে কেনই বা এগিয়ে আসে অমাত্য কৌঞ্চায়ন—না জানি সে বয়ে নিয়ে আসছে কোন অশুভ সংবাদ! বিচলিত কৌঞ্চায়ন অভিবাদনান্তে জানায়—"রাজকন্যা খেলা শেষে যখন নিজের শিবিকায় ফিরছিলেন তখন প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে এলো এক উন্মত্ত হস্তী! কুরংগী ভয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন, আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত!—এমন সময় এক সুদর্শন বলবান যুবক এসে অভয় দিয়ে সদর্পে এগিয়ে গেল সেই উন্মত্ত হস্তীর দিকে—তখন রাজকন্যাকে ছেড়ে সে মত্ত দানবের মত ধাবিত হলো সেই যুবকের প্রতি—এই সুযোগে রাজকন্যাকে শিবিকায় তুলে দ্রুত পালিয়ে এসেছি।" কন্যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হলেন—রাজদম্পতী; কিন্তু সেই অসম সাহসী যুবকের পরিণাম কি হলো? আরেক অমাত্য ভূতিক ফিরে আসে এই সংবাদ নিয়ে—"যুবকটি অসাধারণ শক্তিতে হস্তীকে বশ করে ইতিমধ্যেই ফিরে গেছে তার গোপন আবাসে।" যুবক অন্ত্যজ বলে আত্মপরিচয় দিলেও ভূতিকের দৃঢ়বিশ্বাস ইনি সংকুলজাত—কারণ ব্রাহ্মণোচিত সেই রূপ ও ক্ষত্রিয়-সুলভ সেই সাহস ও শক্তির অধিকারী হওয়া কোনো অন্ত্যজের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্যের তেজ কি কখনও হাত

দিয়ে ঢাকা যায়? হয়তো অজ্ঞাত কোনো কারণে ইনি নিজের যথার্থ পরিচয় গোপন রেখেছেন।

আপাততঃ রাজকন্যার বিবাহের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন রাজা। কাশীরাজের দূত উপস্থিত রাজপুত্রের সংগে সম্বন্ধ নিয়ে—এই অবস্থায় কি করণীয়? অমাত্যদের পরামর্শ চাইলেন তিনি। তাঁরা একবাক্যে জানালেন, "বহুপূর্ব থেকেই সৌবীর রাজপুত্র জামাতারূপে মনোনীত—শুধুমাত্র রাজকন্যার অল্প বয়সের জন্য এতদিন শুভকাজ সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া সৌবীর রাজা স্বয়ং রাজ্ঞীর ভ্রাতা—অতএব কাশীর রাজপুত্রকে বাতিল করে এই সম্বন্ধকেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।" কিন্তু সৌবীররাজ তো পুত্রের জন্য দূত পাঠান নি—বহুদিন ধরে তাঁর কোনো খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। চরদের মাধ্যমে শুধু এইটুকুই জানা গেছে যে পুত্রসহ তিনি কোথাও আত্মগোপন করে আছেন—অমাত্যরাই রাজকার্য নির্বাহ করছে। রাজা কুন্তিভোজ ভাবেন, এই গোপনতার কারণ হয়তো অসুস্থতা বা কর্মচারীদের আনুগত্য পরীক্ষার ইচ্ছা। অবশ্য—ব্রাহ্মণের অভিশাপ, কিংবা কোনো ব্রত পালনের প্রয়োজনেও এই গুপ্ত অবস্থান ঘটতে পারে। অতএব এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাশীরাজ দূতকে অবহেলা করা চলে না।

সেই অঘটনের পর অজ্ঞাত পরিচয় যুবক অবিমারক ও রাজকন্যা কুরংগী পরস্পরের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। অন্ত্যজ রূপে পরিচিত অবিমারকের কাছে রাজকন্যা-প্রাপ্তির আশা দুরাশা আবার কুরংগীর ক্ষেত্রেও প্রিয়মিলনের পথে অন্তরায় রাজকুমারীর আভিজাত্য। কি ভাবে এই বাধার প্রাচীর পড়বে ভেঙে, প্রেমিক ধন্য হবে তার দয়িতাকে লাভ করে? কুরংগীর অবস্থা খুবই শোচনীয়—আহার বিহার সাজসজ্জা সবই পরিত্যক্ত, শরীর দিন দিনই ক্ষীণ হয়ে চলেছে—শয়নে-স্বপনে জাগরণে শুধু সেই রহস্যময় পুরুষের চিন্তা। বাধ্য হয়ে তাঁর মাতৃসমা ধাত্রী সখী নলিনিকাকে সংগে নিয়ে গোপনে যাত্রা করল অবিমারকের খোঁজে।

বহু অনুসন্ধানের পর তাঁর আবাসে গিয়ে উপস্থিত—অবিমারকও তখন কুরংগীর চিন্তায় আত্মবিস্মৃত। ধাত্রী জিজ্ঞাসা করে—'কি ভাবছিলেন এত?' প্রকৃত কারণ গোপন ক'রে অবিমারক জানায়—'আমি যোগ-শাস্ত্র বিষয়ে চিন্তা করছিলাম।' পরিহাসপটু ধাত্রী উত্তর দেয়—আমাদের অন্তঃপুরেও একজন এই রকম যোগচিন্তায় নিবিষ্ট। দুজনে মিলিত হয়ে এই চিন্তা করলে ভাল হয় না কি? অবিমারক তো প্রায় আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন—রোগীর কাছে ওষুধ যেন নিজেই উপস্থিত হয়েছে। ধাত্রী জানালেন—অন্তঃপুররক্ষী ভূতিক রাজার সঙ্গে কাশীরাজ্যের দূতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন—সেই সুযোগে রাতের আঁধারে গা-ঢেকে অবিমারক উপস্থিত হতে পারবেন অন্তঃপুরে। পরবর্তী সহায়তার জন্যে ধাত্রী ও সখীরা তো আছেই! অবিমারক সহজেই সম্মতি দিলে তারা ফিরে এল রাজকন্যার কাছে।

অবশেষে 'দিবসের শেষ আলোক মিলাল নগর সৌধপরে'। সূর্য গেল অস্তাচলে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এগিয়ে চলে মধ্যরাত্রের দিকে। অবিমারক কৃষ্ণবেশে সজ্জিত হয়ে হাতে খড়্গ ও প্রাসাদে আরোহণের উপযুক্ত রজ্জু নিয়ে রাজপুরীতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সখা বিদূষক শঙ্কিত হয় তাঁর নিরাপত্তার চিন্তায়—বহুভাবে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু নির্ভীক অবিমারক সংকল্পে অবিচল; নিজ বাহুবলের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা।—এমনকি বিদূষকের সংগদানের প্রস্তাবকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন—কারণ—

একঃ পরগৃহং গচ্ছেদ্ দ্বিতীয়েন তু মন্ত্রয়েৎ।
বহুভিঃ সমরং কুর্য্যাদিত্যয়ং শাস্ত্রনির্ণয়ঃ॥

শাস্ত্রবচন অনুসারে—'যুদ্ধক্ষেত্রে বহুজনের, মন্ত্রণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনের সঙ্গ কাম্য হলেও পরগৃহেগমন শুধুমাত্র একারই করা উচিত।' অতএব তাঁর যাত্রা হলো শুরু।

এদিকে কুরংগীর দুঃখের সীমা নেই—কাশীরাজ পুত্রের সংগে বিবাহ প্রায় স্থির। রাজ্ঞীর সনির্বন্ধ অনুরোধে শুধু কয়েকটা দিন

সময় পাওয়া গেছে। রাজকুমার এসে পৌঁছলেই বিবাহ হ'বে। ভারাক্রান্তচিত্তে রাজকন্যা শুয়ে আছেন প্রাসাদ শিখরের শিলামঞ্চে—কাছে একমাত্র সখী—নলিনিকা। অন্ধকার পথে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেন অবিমারক—রক্ষীদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে মাঝে মাঝেই তাঁকে পথের পাশে প্রাচীরের আড়ালে আত্মগোপন করতে হচ্ছিল। মধ্য রাত্রির গাঢ় তমসায় সবকিছুই আবৃত! নানা বাধা অতিক্রম করে অবশেষে রাজপ্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলেন তিনি—নির্ভুল নিশানায় কোমরে সংলগ্ন দড়িটির একপ্রান্ত ছুঁড়ে দিলেন প্রাচীরদণ্ডে—এবার সেই দড়ি বেয়ে পৌঁছে গেলেন প্রাচীরের অপর পারে। ধাত্রী পথের নির্দেশ আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। নকল ঝরনা—নকল পাহাড়ে সাজানো বাগান পেরিয়ে এসে গেলেন রাজকুমারীর মহলের সামনে। অন্তঃপুরের পাহারার কড়াকড়ি আজ অনেক শিথিল—কারণ ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ভূতিকই তো অনুপস্থিত—কাশীর রাজকুমারকে আনতে গেছেন তিনি। অবিমারক কাঠের জালে ঘেরা অলিন্দ বেয়ে ছাদে উঠে পড়লেন সহজেই, ইতিমধ্যেই অবশ্য কৃষ্ণবেশ ছেড়ে নায়কোচিত বেশভূষা করে নিয়েছেন।

প্রাসাদশীর্ষে শায়িতা রাজকন্যা—পদতলে সেবারতা সখী নলিনিকা। আধো ঘুমে আধো জাগরণে কুরংগী সখীকে জিজ্ঞাসা করেন—'এখন কত রাত্রি?' নলিনিকা—'এখন প্রায় মধ্য রাত্রি'

—'তাহলে তুমি এখন আমায় আলিংগন করে বিদায় নাও।' —হস্ত প্রসারিত করে দিলেন রাজকন্যা! নলিনিকার ইংগিতে সেই বাহুপাশ গ্রহণ করেন স্বয়ং অবিমারক।

এ কার পরুষ আলিংগন! চম্‌কে ওঠেন রাজকন্যা,—এতো নলিনিকা নয়! বাতাহতা লতার মতই কম্পিতা কুরংগী নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। অবিমারক অবশ্য তাঁর এই চপলতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন কিন্তু বাঞ্ছিত সান্নিধ্যলাভে দুজনের অংগই বিবশ—

ধাত্রী এসে এই অবস্থা থেকে তাঁদের উদ্ধার করে। সাদরে দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হলো শয়নগৃহে—যেখানে রচিত হয়েছে বাসর শয্যা। এক সংগে দুজনে হেঁটে চললেন কয়েক পা—অতএব বিবাহের সপ্তপদী অনুষ্ঠান তো এখানেই সারা! রাজদম্পতীর অগোচরে ধাত্রী ও সখীর সহায়তায় রাজকন্যা লাভ করলেন আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়সঙ্গ।—কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। অল্পকাল পরেই রাজার কানে এলো নানা রকম কানাঘুষা—কন্যান্তঃপুরের পবিত্রতা নাকি কোনো অবাঞ্ছিত অতিথির আগমনে নষ্ট হতে বসেছে—ফলে পাহারার ব্যবস্থা খুবই কড়াকড়ি করা হলো। আবিমারক তো কোনো মতে পালিয়ে বাঁচলেন—রাজকন্যার অবস্থা হয়ে উঠলো খুবই শোচনীয়।

দিন যায়। প্রিয়া-বিচ্ছেদে অবিমারক খুবই কাতর হয়ে পড়েন—কুরংগীহীন জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন—অবশেষে পর্বতশিখর থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করাই স্থির করেন। নগরোপান্তের পর্বতে এসে স্নান করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে প্রস্তুত হচ্ছেন আসন্ন চরম মুহূর্তটির জন্যে—এমন সময় আকাশপথে বিচরণশীল এক বিদ্যাধর দম্পতী বিশ্রামের প্রয়োজনে সেখানে উপস্থিত। চমকিত অবিমারক পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন ইনি মেঘনাদ নামে বিদ্যাধর, সংগে পত্নী সৌদামিনী। ওদের গন্তব্য মলয় পর্বত কারণ সেখানে আজ বিদ্যাধরদের উৎসব। এবার অবিমারকের আত্মপরিচয় দানের পালা। মৃত্যুর পূর্বে মিথ্যাভাষণ অনুচিত—অতএব বাধ্য হয়েই সত্য পরিচয় প্রকাশ করেন—'সৌবীর রাজপুত্রোঽবিমারকো নামাস্মি।' বিদ্যাধর—'এখানে একাকী আগমনের হেতু কি?' অবিমারক নিরুত্তর। বিদ্যাধর তখন দৈবী ক্ষমতায় সহজেই জানতে পারলেন সব ঘটনা। সহানুভূতি জাগে তাঁর অন্তরে। সাহায্যের ইচ্ছায় অবিমারককে একটি অংগুরীয়ক দান করে তিনি বললেন—'এইটি দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় ধারণ করলে অদৃশ্য হওয়া যাবে, আবার বাম করে অর্পণ করলে পূর্বরূপ ফিরে আসবে।' আর দিলেন একটি উজ্জ্বল দৈব

খড়্গ! অবিমারক আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় বিদায় জানালেন সেই বিদ্যাধরদম্পতীকে। আপাততঃ তাঁর প্রাণত্যাগের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নেই কারণ এই মায়া-অংগুরীয়কের সাহায্যে তিনি সহজেই কুরংগীর কাছে উপস্থিত হতে পারবেন। বিদূষকও তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেই স্থানে এসে পৌঁছেচে—অবিমারক সখার কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। এবার মায়া-অংগুরীয়কের বাস্তব প্রয়োগ—ঐটি পরে অবিমারক নিজেই শুধু অদৃশ্য হলেন না, হস্ত স্পর্শে বিদূষককেও অদৃশ্য করে নিয়ে রওনা দিলেন রাজপুরীর উদ্দেশ্যে। এতদিন রাত্রির অন্ধকারেও যেখানে প্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল সেখানে দিবালোকে সখাসহ নিঃশঙ্কচিত্তে ঢুকে পড়লেন—অংগুরীয়কের এমনই প্রভাব!

বর্ষা সমাগত। এ সময় সুখী-মানুষের মনই উতলা হয়ে পড়ে, বিরহক্লিষ্টা রাজকন্যার কথা তো বলাই বাহুল্য! অতি করুণ তাঁর অবস্থা; পরিজনেরা বকুল-কদম্ব-কেয়া বর্ষার নানা ফুল এনে তাঁর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে—অংগে দেয় কালাগুরু ও চন্দনের প্রলেপ—কিন্তু তাঁর বিরহতাপের লাঘব হয়না বিন্দুমাত্রও। ঘনমেঘে নববর্ষণের সংকেত—রাজকন্যার মনে জাগে এই নব বর্ষার ধারাজলে স্নানের অভিলাষ। নলিনিকা গেল স্নানের উপকরণ আনতে। একাকিনী রাজকন্যা মর্মপীড়ায় ব্যাকুলা—দয়িতের চিন্তায় বিবশা। হঠাৎ শোনা যায় মেঘের ঘনঘোর গর্জন—ভীত, চমকিত হয়ে চীৎকার করে ওঠেন তিনি—'পরিত্রায়স্ব, পরিত্রায়স্ব মাম্'—রক্ষা কর, রক্ষা কর আমাকে। আত্মপ্রকাশের এই সুযোগের অবহেলা করলেন না অবিমারক—বাম করে অংগুরীয়ক ধারণ করে শরীরীরূপ ফিরে পেয়েই গাঢ় আলিংগনে আবদ্ধ করলেন রাজকন্যাকে। সব জ্বালা যেন মুহূর্তেই জুড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে নলিনিকা প্রত্যাগতা—রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিল বিদূষক। স্তম্ভিত নলিনিকা—কি করে এই সুরক্ষিত ভবনে এঁদের আগমন সম্ভব হলো? সব বৃত্তান্ত শোনার আশায় সে

বিদূষককে ধরে নিয়ে চললো সখীদের মহলে। কুরংগীর কাছে একা অবিমারক। বাইরে নববর্ষণ স্নাতা পৃথিবী—গৃহাভ্যন্তরে বাঞ্ছিত প্রিয়মিলন লাভ করে ধন্যা রাজকন্যা।

বৈরন্তী নগরীর এই রাজপরিবার মহাসমস্যার সম্মুখীন। বাল্যে রাজকন্যা সৌবীররাজকুমারের উদ্দেশ্যে বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন—কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে এঁদের কোন খোঁজ না পাওয়ায় কাশীর রাজপুত্রকেই কুরংগীর পাত্র হিসাবে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছেন রাজা ও রাণী। পাত্র জয়বর্মাসহ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ভূতিক কাশী থেকে ফিরে এসেছেন—এবার বিবাহ-পর্ব সমাধা হবে। রাজ্ঞীকেও বাধ্য হয়েই জয়বর্মাকে জামাতারূপে মেনে নিতে হয়েছে—কারণ কতদিন আর অপেক্ষা করা চলে নিরুদ্দিষ্ট সৌবীররাজ পরিবারের আশায়? বিষণ্ণ মনে ধাত্রী চিন্তা করে—'কি করা যায় এখন'? এই সংকট মুহূর্তে নলিনিকা এসে রাজ্ঞীকে জানায়—'সৌবীররাজ্যের মন্ত্রীর কাছ থেকে দূত এসেছে—সে বলছে—আমাদের রাজা তোমাদের নগরেই স্ত্রীপুত্রসহ গোপনে বাস করছেন—এই তথ্য গুপ্তচর বহুকষ্টে সংগ্রহ করেছে।' মহারাজ কুন্তিভোজ বাল্যসখা সৌবীররাজের সংবাদ শোনামাত্র বেরিয়ে পড়লেন তাঁর সন্ধানে। সৌবীররাজেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে আত্মগোপনের—তিনিও সহজেই মিলিত হলেন কুন্তিভোজের সংগে! সকলেই উৎসুক আগ্রহে জানতে চায়—'কি কারণে সপরিবারে তাঁর এই আত্মগোপন?' বিবৃত করে চলেন সৌবীররাজ—'চণ্ডভার্গব নামে এক কোপনস্বভাব ঋষির শিষ্য বাঘের হাতে নিহত হয়—ঠিক সেই সময় আমি মৃগয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কুপিত ঋষি আমাকেই মনে করলেন হত্যাকারী। বক্তব্য না শুনেই আমাকে অন্যায়ভাবে ভর্ৎসনা করে চলেন। শেষে আমিও বলে ফেলেছি—'কিছু না শুনেই বিনাদোষে আমাকে তিরস্কার করছেন—আপনি কি ব্রহ্মর্ষি, না চণ্ডাল!' প্রত্যুত্তর শোনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে ঋষি আমাকে অভিশাপ দিলেন—'কি! ঋষিশ্রেষ্ঠ

আমাকে তুমি চণ্ডাল বলার স্পর্ধা কর? তুমিও সপুত্রপরিবার চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও।'—অনেক অনুনয়ের পর তাঁর রোষ শান্ত হলে তিনি পাপের তীব্রতা কিছু হ্রাস করে বললেন—'একবছর গোপনে সপরিবারে চণ্ডালরূপে বাস করতে পারলেই শাপ-মুক্তি ঘটবে।' অতএব এইভাবে এক বছর কাটানোর পর আজ আমি শাপমুক্ত। কুন্তিভোজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার পুত্র বিষ্ণুসেন কিভাবে 'অবিমারক' নামের অধিকারী হলো?" অমাত্য ভূতিকই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন—"এক সময় এক প্রচণ্ড বলশালী অসুর সৌবীররাজ্য ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে—সকলেই যখন আসন্ন বিনাশের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত, তখন কুমার স্বয়ং এগিয়ে গেলেন তার দিকে! অসুরটি তাঁকে উপহাস ক'রে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকে—কিন্তু অসাধারণ বিক্রমে তরুণ বিষ্ণুসেনের হাতেই তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটল। এই অসুর বা 'অবি'কে নিধনের জন্যেই তার নাম হ'লো 'অবি-মারক'।"

কিন্তু বর্তমানে রাজকুমারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না কেন? কি হ'লো তাঁর!—পিতা—পিতৃবন্ধু—সকলেই উদ্বিগ্ন। সব রহস্যের উপর যবনিকাপাতের প্রয়োজনেই বুঝি আবির্ভাব ঘটে দেবর্ষি নারদের। যথারীতি পাদ্যার্ঘ্য প্রদানের পর কুন্তিভোজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'কি কারণে সৌবীর রাজকুমারের এই অদর্শন? নারদ জানালেন—'বিবাহের কারণে।'

কুন্তিভোজ—কোথায় আছেন কুমার?

নারদ—বৈরন্তীনগরে।

কুন্তিভোজ—কার জামাতা হলেন?

নারদ—কুন্তিভোজের।

—এবার সকলের চমকিত হওয়ার পালা। সব বিস্ময়ের কুহেলিকা অপসারিত করে আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করলেন নারদ।—ভার্যাসহ কুমারকে অন্তঃপুর থেকে নিয়ে আসার আদেশ দেওয়া হলো।

এখন জয়বর্মা-সংক্রান্ত সমস্যার কি হবে! এখানেও সমাধান দিলেন দেবর্ষি নারদ। পুত্রের সঙ্গে সমাগতা কাশীরাজ মহিষী সুদর্শনাকে তিনি বললেন—"অগ্নির অংশে তোমার প্রথমে একটি পুত্র জন্মায়। তোমারই ভগিনী সৌবীররাজের পত্নী সুচেতনার প্রসবকালেই সন্তান মারা গেলে তুমি তাকে সেই পুত্র দান করেছিলে; 'বিষ্ণুসেন' বা 'অবিমারক' তোমার সেই প্রথমজাত সন্তান। অতএব কুন্তি-ভোজের কন্যা কুরংগী এখন তোমার দ্বিতীয় পুত্র জয়বর্মার শ্রদ্ধেয়া জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ—এই সম্পর্ক আর অস্বীকার করার উপায় নেই।" এবার নববধূবেশে রাজকন্যা কুরংগী ও অবিমারক সলজ্জভাবে প্রবেশ করেন—হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে সকলেই আশীর্বাদ জানালেন নব-দম্পতীকে। তাঁরাও দেবর্ষির আজ্ঞাক্রমে গুরুজনদের অভিবাদন করলেন—সকলের চক্ষুই বাষ্পাকুল—ঘটলো মিলনমধুর সমাপন।

পঞ্চরাত্র

বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছেন কুরুরাজ দুর্যোধন। পাণ্ডবেরা বনবাসে থাকায় রাজ্য এখন তাঁর কাছে নিষ্কণ্টক—অতএব আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বীয় নিন্দার মূলোৎপাটনই তাঁর লক্ষ্য। এই উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা খ্যাতনামা রাজন্যবর্গ সকলেই তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে সমবেত হয়েছেন—চারিদিকে 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' রব। রাজকীয় সমারোহের সংগেই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হলো। কিন্তু শেষে ঘটে গেল এক অঘটন—যজ্ঞ সমাপনের পর যজ্ঞাগ্নিরক্ষক ব্রাহ্মণ বালকের অনবধানতায় বেদির সম্মুখস্থ যূপকাষ্ঠে আগুন ধরে গেল—ক্রমশ শিখা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে—ঘৃত বহনের কাষ্ঠযান, যজ্ঞের বহিঃগৃহ সব গ্রাস করে পার্শ্বস্থ বনভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পুষ্পময় বৃক্ষগুলি দগ্ধকাষ্ঠে পরিণত হয়। অবশেষে তীরের তৃণভূমি সম্পূর্ণ দহনের পর নদীতে এসে ইন্ধনের অভাবে শান্তিলাভ করে সেই সর্বগ্রাসী হুতাশন। এই অগ্নিদাহের ঘটনা কি আসন্ন যুদ্ধাগ্নিরই ইংগিত ?

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শকুনি ও সমবেত রাজমণ্ডলীসহ প্রবেশ করেন দুর্যোধন। যজ্ঞের সাফল্যে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে—তিনি আজ সকলের প্রশংসাধন্য। হৃষ্টমনে তিনি গুরুজনদের অভিবাদন ও রাজন্যবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু একমাত্র বিরাটরাজ অনুপস্থিত কেন ? তাঁর রাজ্যে কি কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে ; কিংবা তিনি পাণ্ডবদের পক্ষপাতী বলে ? যা হোক, দূত ফিরে এলেই সমস্ত ব্যাপার জানা যাবে। যজ্ঞান্তে গুরুদক্ষিণাদান যজমানের পক্ষে অবশ্য করণীয়—অতএব গুরু দ্রোণকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দক্ষিণা গ্রহণের জন্যে দুর্যোধন অনুরোধ করেন। দ্রোণ কিন্তু সহজে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাননা—অশ্রুতে তাঁর দৃষ্টি রুদ্ধ। বৃদ্ধ আচার্যের অন্তরে কাদের জন্যে দুঃখ জমা হয়ে আছে ? প্রিয় পাণ্ডবদের বনবাস-

জনিত দুরবস্থার জন্যেই কি? কিন্তু গুরুকে যদি সন্তুষ্ট না করা যায় তাহলে তো এই যজ্ঞই নিষ্ফল! গুরুর অশ্রু প্রক্ষালনের জন্যে জল আনতে আদেশ দেন দুর্যোধন—কিন্তু দ্রোণ বলেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই তাঁর দুঃখ দূর হবে—অতএব সেই জল হাতে নিয়েই গুরুর বাঞ্ছা-পূরণের প্রতিজ্ঞা করেন রাজা। পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই দ্রোণ প্রকাশ করেন তাঁর বাসনার কথা—

যেষাং গতিঃ ক্বাপি নিরাশ্রয়াশং সংবৎসরৈর্দ্বাদশভির্ন দৃষ্টা।
তং পাণ্ডবাণাং কুরু সংবিভাগমেষা চ ভিক্ষা মম দক্ষিণা চ॥

'বিগত দ্বাদশবৎসর যাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি সেই নিরাশ্রয় পাণ্ডবদের রাজ্যের ভাগ দাও—ভিক্ষাই বল বা দক্ষিণাই বল—এইটিই আমার আন্তরিক কামনা।' শকুনি সবেগে এগিয়ে এলেন এই প্রস্তাবে—'এই প্রার্থনা তো ধর্মের ছলে দুর্যোধনের প্রতি বঞ্চনা'—শকুনির এই উক্তি দ্রোণকে উত্তেজিত করে তোলে। তিনি বলেন—'ভ্রাতাদের পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলা যদি বঞ্চনা করা হয় তাহলে তারা শক্তি প্রয়োগে প্রাপ্য আদায় করুক—এইটাই কি কাম্য?' উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে কার্যসিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় এগিয়ে আসেন কুরুপিতামহ ভীষ্ম—পাণ্ডবদের অধিকারের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন দুর্যোধনকে; দ্রোণকেও অনুরোধ করেন শান্তভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে। ক্রোধ পরিহার করে দ্রোণ এখন কিছুটা শান্তভাবেই দুর্যোধনকে আবার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। উপায়ান্তর না দেখে চঞ্চলমতি দুর্যোধন বলেন—'বেশ, মাতুলের অনুমোদন লাভ করলেই আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব।' শিষ্যবৎসল গুরু পাণ্ডবদের জন্যে বাধ্য হয়েই শঠ শকুনিরই শরণ নিলেন—তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে একথাও বললেন—'বার্দ্ধক্যজনিত আমার ক্রোধ ক্ষমা কর'। এমনকি শকুনিকে আলিঙ্গন করে তাকে শান্ত করতে চাইলেন—কিন্তু কঠিন শকুনির মন এত সহজে গলার নয়—তাই দুর্যোধন যখন

জিজ্ঞাসা করলেন—'পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধদান বিষয়ে আপনার মত কি?' কঠোর কণ্ঠে শকুনি উত্তর দিলেন—'দেবনা, একথাই নিশ্চিত।' কর্ণের কাছে পরামর্শ চাইতে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। অগত্যা দুর্যোধন মাতুলকেই বললেন—'পাণ্ডবদের প্রদানের জন্যে এমন স্থান চিন্তা করুন যেখানে কোনো শস্য উৎপন্ন হয়না, উপরন্তু বলবান্ শত্রু বর্তমান।' কিন্তু শকুনি জানেন অর্জুনের চেয়ে শক্তিশালী হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, আবার ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রভাবে ঊষর মরুভূমিও উর্বরতা লাভ করবে। কিন্তু জন-সমক্ষে গুরুহস্তে জল দান করে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন তা' কৌরব বংশের মর্যাদার কথা ভেবে দুর্যোধনকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে—তাই শকুনিকে ভাবতে হয় এমন এক শর্তের কথা যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে, প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হয় অথচ রাজ্যও দিতে না হয়। অবশেষে তিনি ঘোষণা করেন—'পঞ্চরাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ এনে দিলে রাজ্যার্ধ দেওয়া যাবে।' এই উক্তিতে দ্রোণ হতাশ হয়ে পড়েন কারণ বিগত দ্বাদশ বৎসর ধরেই দুর্যোধনের চরেরা চেষ্টা করে চলেছে পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়ার। পাশাখেলায় পরাজয়ের আরেকটি শর্ত ছিল যে অজ্ঞাতবাস কালের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেলে বনবাসের কাল আবার দীর্ঘায়িত হবে। অতএব ক্ষুব্ধচিত্তে দ্রোণ বলেন 'বরং স্পষ্ট করেই বল যে দক্ষিণা দান সম্ভব হলো না।' ব্যাপারটি সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই বিরাট রাজ্য থেকে দূত উপস্থিত। সে জানায় বিরাটেশ্বরের শ্যালক কীচক প্রমুখ শত ভ্রাতা কোনো এক অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা বিনাঅস্ত্রে শুধুমাত্র বাহুবলেই নিহত হয়েছেন। এই দুঃখজনক ঘটনাই বিরাট-রাজের দুর্যোধনের যজ্ঞে অনুপস্থিতির কারণ। প্রাজ্ঞ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সহজেই অনুমান করতে পারেন কে এই নিধনপর্বের নায়ক। ভীম-কর্মা ভীমসেন ছাড়া কার পক্ষে আর এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে? দ্রোণকে এ বিষয়ে সচেতন করে দিলে ভীষ্মের

ইংগিতে তিনি পঞ্চরাত্রের শর্তে রাজী হয়ে যান, তাঁদের আশা বিরাট নগরে গেলে হয়তো বা পাণ্ডবদের হদিস মিলতেও পারে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার জন্যে একটা অজুহাতের প্রয়োজন—কি করা যায়! ভীষ্ম উপায় স্থির করেন; তিনি বলেন—'বিরাটরাজ আমাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন বলেই যজ্ঞে উপস্থিত হয় নি; অতএব তাকে শাস্তি দানের জন্যে তার গোধন অপহরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যাক্।' যুদ্ধের আহ্বান এলে ক্ষত্রিয়দের নিঃশব্দ থাকা চলে না—অতএব শকুনিকে সেনাপতি করে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন সহ কৌরব-বাহিনী অগ্রসর হলো বিরাট রাজ্যের দিকে।

বিরাট নগর এখন আনন্দ উৎসবের আয়োজনে মত্ত—বিরাটেশ্বরের জন্মদিন—গোপালকদের পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দেওয়া হবে বিশাল গোবাহিনী—সেগুলি সুসজ্জিত করে উদ্যানের দিকে আনা হচ্ছে তাই গোপালক বালিকারা নৃত্যগীতে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে চলে। হঠাৎ একটি দাঁড়কাক কর্কশ রবে ডেকে উঠ্‌ল কেন? বয়োবৃদ্ধ গোপালক কোনো এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরেই শোনা যায় দুন্দুভি নিনাদ—দারুণ ধূলি ঢেকে ফেলেছে সূর্যের আলো। কারা যেন রথে চড়ে এসে দস্যুর মত গোপপল্লী আক্রমণ করে বসেছে। ভট এসে জানায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা নিষ্ঠুরভাবে গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে কাঞ্চুকীয় এই সংবাদ উৎসবমুখর অন্তঃপুরে মহারাজের কাছে পৌঁছে দেয়—আকস্মিক বিপদে সবাই স্তব্ধ। বিচলিত বিরাটরাজ গাভীরক্ষায় অসমর্থ, নিজ ক্ষত্রিয়ত্বকে ধিক্কার দিয়ে রথ প্রস্তুত করতে বলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কৌরবদের কেন এই আক্রমণ? রাজসভায় এসে ডেকে পাঠালেন তাঁর কাছে আশ্রয়গ্রহণ-কারী ভগবান নামে ব্রাহ্মণকে—হস্তিনাপুর এঁর বাসভূমি। অতএব কৌরবদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কিছু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের আক্রমণের সংবাদে ভগবান এত কুণ্ঠা বোধ করছেন

কেন? তাঁর সামনেই বিরাটরাজ বলেন—বিনাযুদ্ধে এই অন্যায় আক্রমণ সহ্য করা সম্ভব হবে না। একমাত্র ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির ছাড়া কৌরবদের অপরাধ আর কারও কাছে ক্ষমার অযোগ্য। যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাশীলতার প্রশংসা এই ব্রাহ্মণকে কেন যেন আনন্দিত করে তোলে। বিরাটরাজ যুদ্ধযাত্রার জন্যে নিজ রথ আনয়নের আজ্ঞা দিলেন—কিন্তু সারথি এসে জানায় রাজার ব্যবহৃত রথটিই নিয়ে রাজকুমার উত্তর কৌরবদের বাধা দিতে চলে গেছেন। কিন্তু সারথি তো এখানে উপস্থিত! তাহলে কে চালিয়ে নিয়ে গেল কুমারের রথ? দূত নিবেদন করে রাজকুমারীর নৃত্যশিক্ষক স্ত্রী-বেশী বৃহন্নলাকেই কুমার সারথি রূপে গ্রহণ করেছেন—এই সংবাদ স্বভাবতঃই কুমারের নিরাপত্তা সম্বন্ধে রাজাকে চিন্তিত করে তোলে—কিন্তু ভগবান্ তাঁকে আশ্বাস দিতে থাকেন। এই সময় ভট এসে জানায়—'কুমার পরাজিত হয়ে রথসহ শ্মশানের দিকে পলায়ন করেছেন।' এই সংবাদে ভগবান যেন কি চিন্তা করে আশান্বিত হয়ে রাজাকে বলেন—'রথ শ্মশানে যাওয়ায় একথাই সূচিত হচ্ছে যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা যেখানে আছে সেইস্থান শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হবে।' বলাবাহুল্য ব্রাহ্মণ ভগবানের এই নির্বেদ রাজা বিরাটের বিরক্তি উৎপাদন করে—তিনি তো বলেই বসেন—'ভগবন্, অকালে স্বস্থবাক্যং মন্যুমুৎপাদয়তি।' 'দুঃসময়ে এইরকম নিশ্চিন্ত কথাবার্তা ক্রোধই জন্মায়।' এই মুহূর্তেই ভট এসে জানায়—শ্মশানে স্বল্পসময় বিশ্রাম করে ফিরে এসে কুমারের রথ যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিয়েছে। শত শত শরাঘাতে কৌরব পক্ষ প্রায় বিধ্বস্ত—রথী মহারথীরা পলায়িত—কুমারের রথ থেকে নিক্ষিপ্ত শরপ্রবাহে যেন নদীর সৃষ্টি হয়েছে! রাজা পুত্রের কৃতিত্বে পুলকিত, গৌরবান্বিত। 'এখনও শুধু অর্জুনপুত্র বালক অভিমন্যু একা যুদ্ধ করছেন'—একথা শুনে যখন ভগবান্ বললেন—'তাহলে অন্য সারথি প্রেরণ করুন, কারণ পাণ্ডব ও যাদব—এই দুই বংশের তেজাগ্নি স্বরূপ অভিমন্যুকে দেখে বৃহন্নলা অভিভূত হয়ে

পড়বেন—তখন বিরাটরাজ ক্ষুব্ধভাবে বলে ওঠেন—'ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথের মত বীরদের পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন তিনি কি শুধুমাত্র অভিমন্যুর পিতৃপরিচয়ের ভয়েই তাকে পরাজিত করতে অসমর্থ হবেন ?' কিন্তু সত্যিই কুমার উত্তরই কী এই বীরশ্রেষ্ঠদের রণবিমুখ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ? কে এই সারথি বৃহন্নলা ? শ্মশান থেকে রথ প্রত্যাগত হতেই বা যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হলো কেন ? কিভাবে সম্ভব হলো এই শত শত শরবর্ষণ ? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যিনি নিশ্চিত সেই ব্রাহ্মণ ভগবান্ই বা কে ? অবশ্যই যথাকালে এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হবে।

কৌরবদের গোগ্রহণের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ফিরে আসে কুমারের রথ। তখনই কুমার রাজসমীপে উপস্থিত হতে পারলেন না—কারণ তিনি যুদ্ধের বিবরণ ও সৈন্যদের কৃতিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকেন। রাজার আহ্বানে শুধু বৃহন্নলাই রাজসভায় আসেন—দূর থেকে ভগবান্কে দেখেই শ্রদ্ধার সংগে তিনি ভাবেন—যৌবন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সন্ন্যাসব্রতধারী এই রাজা রাজ্যহীন হলেও শ্রীহীন নয়, রাজদণ্ডধারণের পরিবর্তে ইনি সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড ধারণ করেছেন। রাজা বিরাটের আদেশে বৃহন্নলা রণবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে উদ্যত হতেই ভট প্রবেশ করে এক আনন্দ সংবাদ নিয়ে—'সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু বন্দী হয়েছেন।' বৃহন্নলা বিস্মিত—অতুলনীয় বীরত্বের অধিকারী এই বালককে কে বন্দী করতে সক্ষম! ভট জানায়, 'রাজার নবনিযুক্ত পাচকই অমানুষিক শক্তিতে অভিমন্যুর রথ স্তব্ধ করে দিয়ে তাকে শুধুমাত্র বাহুবলেই বন্দী করে এনেছেন।' কী যেন চিন্তা করে বৃহন্নলা আশ্বস্ত হলেন। কারণ বৃহন্নলার বাণের আঘাতে কৌরবরথীরা যখন বিক্ষিপ্ত—ছিন্নভিন্ন—তখন কিশোর অভিমন্যু একাই নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সসম্মানে অভিমন্যুকে রাজসভায় আনার জন্যে আদেশ দিলেন রাজা। সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু অবশ্যই আদরের পাত্র কারণ পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদের সংগে বিরাটের আত্মীয়তা আছে। আবার

কন্যার পিতা হিসাবে সম্ভাব্য জামাতা-তুল্য তরুণ অভিমন্যুকে অবহেলা করা চলে না। তাছাড়া পাণ্ডবদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিরাট-রাজ অর্জুনপুত্র অতিথি অভিমন্যুর প্রতি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করতে বাধ্য। অতএব অভিমন্যুকে সভায় উপস্থিত করার জন্যে বৃহন্নলাই প্রেরিত হলেন। প্রথমে সেই পাচক-বেশধারী বলবান্ ব্যক্তি ও পরে অভিমন্যুসহ বৃহন্নলা প্রবেশ করে। অভিমন্যুর অন্তরে প্রশ্ন—বিশালবক্ষ-ক্ষীণকটি-বৃষস্কন্ধ কে এই পুরুষ যিনি কোনো ক্লেশ না দিয়েই রথ থেকে আমাকে একহাতে তুলে এনেছেন? আবার বৃহন্নলাও তাঁর মনে এই চিন্তা জাগায়—উমা বেশাশ্রিত শঙ্করের মত নারীবেশধারী এই ব্যক্তিই বা কে? বৃহন্নলা তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করে মাতার ও মাতুল কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করায় এই নীচপদে নিযুক্ত কর্মীদের ধৃষ্টতায় অভিমন্যু বিস্মিত—বিরক্ত। বিদ্রূপের সংগেই তিনি বলেন—'আপনি যেন পিতৃসুলভ ভংগীতে আমার মাতার ও মাতুলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন? নাকি বিরাট নগরে বন্দীদের সংগে এই রকম অপমানজনক ব্যবহার করাই রীতি!' বালকের এই ক্রোধ অনেকের কাছেই কৌতুকাবহ। বৃহন্নলা ভর্ৎসনার সুরে বলেন—'পরাজয়বরণ করে পিতা এবং মাতুল বংশের সম্মান তুমি উপযুক্ত ভাবেই রক্ষা করেছ।' এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য অভিমন্যুর উত্তর—'আত্মস্তুতি না করেও একথা বলা যেতে পারে যে নিহত সৈনিকদের দেহে বিদ্ধশরে লেখা নামই আমার সপক্ষে প্রমাণ। তবে যিনি রথ থেকে আমাকে তুলে আনেন তিনি অস্ত্রহীন ছিলেন বলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসারে সেই ব্যক্তিকে আঘাত করা সম্ভব হয়নি।' একথাও সে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আমাকে যেমন বিনা অস্ত্রে বাহুবলে বন্দী করে আনা হয়েছে মধ্যমতাত ভীমও তেমনি আমাকে বাহুবলেই মুক্ত করে নিয়ে যাবেন।' বালকের এই আত্মবিশ্বাস ও বীরত্বপূর্ণ উক্তিতে ভগবান, বৃহন্নলা, ভীমকায় পাচক সকলেই সন্তুষ্ট হলেন—রাজা বিরাটও মুগ্ধ। এবার কুমার উত্তর সভায়

উপস্থিত হলেন—সমস্ত রহস্যের জাল ছিন্ন করে তিনি বিরাট-রাজকে জানালেন—'এখন পূজ্যতমের পূজা করা উচিত।'—'কিন্তু কে এই পূজ্যতম?'—'কেন, এই যুদ্ধে যাঁর সমস্ত কৃতিত্বই প্রাপ্য, সেই মহামান্য ধনঞ্জয়ের? তিনিই তো শ্মশান থেকে গাণ্ডীব ধনু এনে বারিবর্ষণের মত শরবর্ষণে শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। তাঁর হাতে জ্যাঘাতের চিহ্ন দ্বাদশ বৎসর অব্যবহৃত হলেও এখনও বিদ্যমান।' কিন্তু বৃহন্নলা পরিচয় অস্বীকারের চেষ্টায় বলেন—'আসলে ও গুলি বলয়ের ঘর্ষণের দাগ।'—এবার সবসমস্যার সমাধান করে দিয়ে ব্রাহ্মণ ভগবান্ জানালেন—'আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই, কারণ অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ।' সকলেই এখন নিঃসন্দেহ যে—এই ব্রাহ্মণ বেশধারীই যুধিষ্ঠির, বৃহন্নলা ছদ্মবেশী অর্জুন ও ভীম-বলশালী পাচকই ভীমসেন—এঁদের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে অভিমন্যু সসম্ভ্রমে প্রণাম জানালেন। বিরাটেশ্বরও বলেন—'সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরপাণ্ডবদের বাসহেতু আমার বংশ ধন্য।' তিনি যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্যে অর্জুনের উদ্দেশে উত্তরাকে দান করেন—কিন্তু অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর সংগে বিবাহের জন্যেই উত্তরাকে মনোনীত করেন। আজই প্রশস্ত তিথি। অতএব কুরু বৃদ্ধ ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণের জন্যে কুমার উত্তর কৌরব শিবিরে যাত্রা করেন।

অভিমন্যুর বন্দী হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছায় কৌরব শিবিরে। ভীষ্ম, দ্রোণ সকলেই ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন। দুর্যোধন যে-কোনো মূল্যেই তাকে মুক্ত করে আনতে বদ্ধ পরিকর—কর্ণ তো অভিমন্যুকে রক্ষা করতে অসমর্থ হওয়ায় ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বনগমনই শ্রেয় বলে মনে করেন। শকুনি অবশ্য নিরুদ্বেগ! তাঁর মতে পাণ্ডবপুত্রের মুক্তির ব্যবস্থা পাণ্ডবেরাই করতে পারবে, অতএব চিন্তার বিশেষ কোনো কারণ নেই। কিন্তু কে এই সিংহ-শিশুকে জালে আবদ্ধ করল? সারথি অভিমন্যুর বীরত্বের বর্ণনা করে জানায়—এক অমিত বলশালী পুরুষ কর্তৃক অভিমন্যু ধৃত হয়েছেন—শুধুমাত্র তাঁর বাহুর ভরেই অশ্বগুলি

গতিহীন ও রথ নিষ্কম্প হয়ে পড়ে।' ভীষ্ম দ্রোণের কাছে আর এই পুরুষের পরিচয় গোপন থাকে না—মহাবলী ভীমসেন ছাড়া এমন মহামান্য শক্তিধর আর কে হতে পারে! শকুনি অবশ্য এই যুদ্ধে পরাজয়ের ব্যাপারে পাণ্ডবদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিতে চান—কিন্তু দ্রোণ ও ভীষ্ম ধনুকের টঙ্কার—অবিরাম শরবর্ষণ—ভীষ্মের রথের শিরোদেশে লগ্ন প্রণামসূচক তীরে মুদ্রিতনাম ইত্যাদি প্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে বিরাট পক্ষে যোদ্ধা আর কেউই নয়—স্বয়ং গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন। শকুনি এখনও চেষ্টা করে চলেন ব্যাপারটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এই অজুহাতে যে অর্জুন নামে অন্য কোনো সৈনিকের নিক্ষিপ্ত বাণ হতে পারে—কারণ পাণ্ডবদের অস্তিত্ব একবার প্রমাণিত হয়ে গেলে প্রতিজ্ঞা অনুসারে অর্ধরাজ্য দান করতে হবে, যেহেতু পঞ্চরাত্র শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু শকুনির এই প্রয়াস বেশীক্ষণ কার্যকরী হলো না—কুমার উত্তর দ্বারে উপস্থিত। যথাযথ অভিবাদনের পর যুধিষ্ঠিরের পক্ষ থেকে তিনি জানতে চান—'উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে—হস্তিনাপুরে অথবা বিরাট নগরে?' অনুষ্ঠান বিরাট নগরেই সম্পন্ন হবে—এ কথাই স্বীকৃত হয়। পাণ্ডবদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দ্রোণের অভীষ্ট সংবাদ-প্রাপ্তি ঘটেছে—অতএব তিনি দুর্যোধনকে তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দেন—"ইত্যর্থং বয়মানীতাঃ পঞ্চরাত্রোঽপি বর্ততে, ধর্মেণাবর্জিতা ভিক্ষা ধর্মেণৈব প্রদীয়তাম্।"

যে উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আগমন তা এখন সিদ্ধ হয়েছে—'পঞ্চরাত্র পূর্ণ হওয়ারও দেরী আছে; অতএব ধর্মপালনের জন্যে যে ভিক্ষাদানের প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা' ধর্মরক্ষার্থেই প্রদান কর।' সুতরাং সত্যরক্ষার্থে দুর্যোধন পাণ্ডবদের জন্যে অর্ধরাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন—কারণ 'মৃতেঽপি হি নরাঃ সর্বে সত্যে তিষ্ঠন্তি তিষ্ঠতি।' সত্যরক্ষা করতে পারলে মৃত্যুর পরেও মানুষ অমরতা লাভ করে।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্র শৌর্যে ও পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য ; আবার নায়ক রূপেও তিনি বিদগ্ধ ! অন্তঃপুরে তাঁর একাধিক মহিষী—প্রধানা রাজ্ঞী ধারিণী, একদিন এক চিত্রফলকে অঙ্কিত ধারিণীর জনৈকা পার্শ্বচারিণীর ছবি তাঁকে আকৃষ্ট করে—কে এই অপরূপা ! যৌবন যার অঙ্গে সবে বাঁশীতে সুর তুলেছে—অথচ কৈশোরের পবিত্রতা যাকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। কামদেবের আসন যেন সবে পাতা হচ্ছে সলাজ বঙ্কিম কটাক্ষে স্ফুরিত অধরে, বরতনুর লাস্যময় ভঙ্গিমায় ! মোহিত হলেন রাজা ; নবমধুলোভী মধুকর সরস মধুপানের আশায় লুব্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই পটে লিখা ছবির স্বরূপ পরিচয় কি ?

অনুসন্ধিৎসু অগ্নিমিত্র শুধুমাত্র এইটুকুই জানতে পারলেন যে রাণী ধারিণীর ভ্রাতা সীমান্তের দুর্গরক্ষক বীরসেন এই বালিকাকে ধারিণীর আশ্রয়ে প্রেরণ করেছেন। রাজ্ঞী একে নৃত্যগীতাদি কলা-বিদ্যায় সুনিপুণা করে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন নাট্যাচার্য গণদাসের উপর। রাজপুরীতে আর এক নাট্যগুরু আছেন—হরদত্ত। রাজবয়স্য বিদূষককে অগ্নিমিত্র তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কথা জানালেন। বিদূষক রাজার মালবিকা দর্শনের অভিলাষ পূরণের জন্যে আশ্রয় নিল এক কৌশলের। দুই নাট্যাচার্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে শুরু হলো বিবাদ। রাজ্ঞী ধারিণীর সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করতেন এক বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা—নাম পণ্ডিত কৌশিকী ; রাজদম্পতির অত্যন্ত সম্মানীয়া তিনি। তাঁর পূর্ব-পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। এই পরি-ব্রাজিকার পরামর্শ অনুসারেই স্থির হলো যে এক নৃত্যসভার আয়োজন

করে শিষ্যদের অভিনয়ের উৎকর্ষ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে আচার্যদের শ্রেষ্ঠত্ব। সকলেই সম্মত হলেন।

যথাসময়ে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। রাজা অগ্নিমিত্র, রাজ্ঞী ধারিণী, পণ্ডিত কৌশিকী ও বিদূষক—সকলেই দর্শক-মণ্ডপে উপবিষ্ট। প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠায় রাজার প্রতিটি মুহূর্ত কাটে। বেজে উঠলো—মধুর মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী। যবনিকা হলো অপসৃত। ধীরপদবিক্ষেপে আচার্য গণদাসের পশ্চাদবর্তিনী মালবিকা প্রবেশ করেন মঞ্চে। রাজার প্রতিটি ইন্দ্রিয় ব্যগ্র! চিত্রে অঙ্কিতা মালবিকার চেয়ে সহস্রগুণে গরীয়সী শরীরিণী মালবিকা। আভরণের বাহুল্য না থাকায় প্রতিটি অঙ্গবৈশিষ্ট্যই সুপরিস্ফুট। যথার্থ নৃত্যোপযোগী অঙ্গসংস্থান—ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্ব—সুডৌল বাহুবল্লরী—পীনবক্ষ ; —লাবণ্যের যেন প্রতিমূর্তি। অভিবাদনান্তে মালবিকা শুরু করে শাস্ত্রীয় অভিনয় ছলিক, সঙ্গে সঙ্গীত—

হৃদয় রে তোর কেন আর আশ
দুর্লভ প্রিয় তরে
বাম আঁখি কেন ফু'রে বার বার
বৃথা এ কামনা লয়ে।
কতকাল পরে প্রিয়দরশনে
জীবন ধন্য মানি,
তৃষাতুরা আমি, অন্তরতম
তোমারেই শুধু জানি।

অগ্নিমিত্রের উদ্দেশেই যেন তাঁর এই প্রেম নিবেদন। অতুলনীয় কুশলতার সঙ্গে মালবিকা নাট্যরস সৃষ্টি করেন। গণদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। নৃত্য সমাপ্ত—কিন্তু এখনই কি মালবিকা বিদায় নিয়ে চলে যাবেন অগ্নিমিত্রের দৃষ্টির অন্তরালে? এগিয়ে এলো বিদূষক—অভিনীত নাট্যকলা সম্বন্ধে প্রশ্নের ছলে বিদায়-

মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করে তোলে। অতৃপ্ত নয়নে রাজা পান করে চলেন মালবিকার রূপসুধা! কিন্তু তৃষ্ণা তাঁর মেটে না—রাজ্ঞীর আহ্বানে চলে যেতে হলো অন্তঃপুরে।

মালবিকাই রাজার একমাত্র আরাধ্যা—আকুল হৃদয়ে তিনি মালবিকাকে কামনা করে চলেছেন।—

> সর্বান্তঃপুরবণিতাব্যাপারং প্রতি নিবৃত্তহৃদয়স্ত।
> সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়নীভূতা॥

বিদূষকসহ অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্যানে আসেন তিনি অন্তরের কাতরতা ভুলতে। অপূর্ব শোভা উদ্যানের। বসন্তের সৌন্দর্যলক্ষ্মী যেন রাজাকে বিমোহিত করার জন্যেই এমন নয়নাভিরাম রূপ ধারণ করেছেন—অশোকের উজ্জ্বল রক্তিমা যেন তাঁর অধরশোভা—কুরুবকের বর্ণাঢ্য সমারোহ যেন কপোলতলে পত্রলেখা। তিলফুলের উপর উপবিষ্ট ভ্রমর যেন রমণীকুলের ললাটে তিলকসজ্জার গর্বকে খর্ব করেছে। শ্রবণকে আনন্দ দিচ্ছে কোকিলের কুহুস্বর, আর স্পর্শসুখ বিধান করে চলেছে মৃদু মলয় পবন। মুগ্ধ হলেন রাজা।

মালবিকাও এসেছেন সেই উদ্যানে—উদ্দেশ্য দেবী ধারিণীর প্রিয় রক্তাশোক বৃক্ষটিকে দোহদ দান। সুন্দরী যুবতীর পদাঘাতে অশোক বৃক্ষে দেখা দেয় মুকুল—এই ছিল প্রচলিত ধারণা। দেবী স্বয়ং অসুস্থ হওয়ায় তাঁর আদেশে মালবিকার উপরই এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অন্তরাল থেকে মালবিকার আগমন লক্ষ্য করে বিদূষক রাজাকে জানালো সে কথা। মালবিকা অবশ্য রাজা ও রাজবয়স্যের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রাজাকে সেই নৃত্যসভায় দেখার পর থেকে মালবিকাও অনন্যহৃদয়া। সখী বকুলাবলিকার অপেক্ষায় উপবেশন করেন শিলাতলে। দুর্ভাগিনী মালবিকা নিজের দুঃসাধ্য আকাঙ্ক্ষার জন্য নিজেকেই ভর্ৎসনা করেন।

হিঅঅ ! ণিরবলম্বণাদো অদিভূমিলঙ্ঘিণো
মনোরহাদো বিরম, কিং মং আআসিঅ।

‘হে হৃদয় তোমার এই মনোরথ দূর কর—এ শুধু সুউচ্চ স্থান লঙ্ঘনের ইচ্ছা তাই নয়—এই অভিলাষ সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন।’ মালবিকার এই বিলাপ রাজাকে উৎফুল্ল করে তোলে। সখী বকুলাবলিকা এসে মালবিকাকে মনোরম সজ্জায় সজ্জিত করে। অন্তরাল থেকে সে ভুবনমোহনরূপ দেখে রাজা মোহাবিষ্ট, এদিকে সহচরী নিপুণিকার সঙ্গে রাজার অন্যতমা মহিষী ইরাবতী আসছেন প্রমোদ কাননে। প্রথমে তিনি ছিলেন রাজ্ঞী ধারিণীর সখীমাত্র, পরে রাজানুগ্রহে—মহিষীর মর্যাদা লাভ করেন। মালবিকাদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন রাজার প্রিয়তমা। মদস্খলিত চরণে তিনি রাজার অন্বেষণ করেন প্রমোদবিলাসের ইচ্ছায়। সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়ে বকুলাবলিকার দ্বারা সুসজ্জিতা মালবিকার দিকে—অন্তরে অনুভব করেন সহস্র বৃশ্চিকদংশন। দেবীর নূপুর মালবিকার পায়ে অশোকবৃক্ষে দোহদের প্রয়োজনে। কিন্তু তাঁর চমক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে তখনও বাকী।

বকুলাবলিকা ধীরে ধীরে রাজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কৌশলে জেনে নেয় মালবিকার অন্তরের কথা। দূতীরূপে রাজার প্রণয়-বার্তাও জ্ঞাপন করে সলজ্জা মালবিকাকে। তারপর অশোকপল্লবের কর্ণভূষায় শোভিতা হয়ে মালবিকা রক্তাশোকে পদাঘাতে দোহদ দান করেন। সুন্দরীর পদাঘাত রাজার অন্তরকে কামনাতুর করে তোলে—স-বিদূষক তিনি আবির্ভূত হন মালবিকার সম্মুখে। পরিহাসচ্ছলে বিদূষক বলে—‘রাজার প্রিয় এই অশোক বৃক্ষে তুমি কিনা বাঁ পায়ে আঘাত করলে ?’ সরলা মালবিকা এই অভিযোগের পর রাজাকে সম্মুখে দেখে সন্ত্রস্তা। রাজা দুহাতে ধরে তুললেন প্রণতা মালবিকাকে—প্রশ্ন করলেন—অশোকবৃক্ষে দোহদদানের পরিশ্রমে তোমার কোমলপদে কোন আঘাত লাগেনি তো ? সচকিতা মালবিকা

স্থানত্যাগের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—কিন্তু তাঁর বিদায় নেওয়ার আগেই রাজা ব্যক্ত করেন তাঁর অভীপ্সা। আর তো সম্ভব নয় ধৈর্য রক্ষা। অনন্যচিত্ত এই প্রেমিককে তোমার স্পর্শামৃত দানে ধন্য কর। 'স্পর্শামৃতেন পূরয় দোহদমস্যাপ্যনন্যরুচে'। অন্তরাল থেকে সমস্ত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করছিলেন ইরাবতী। আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না তিনি! সহসা আত্মপ্রকাশ করে বলে উঠলেন 'রাজ-প্রার্থনা যখন, পূরণ করা উচিত বৈকি, আর অশোকবৃক্ষে ফুল যদি নাও ফোটে, রাজার বাঞ্ছাপূরণেই ইষ্টসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।' সকলেই চমকিত! বকুলাবলিকা ও মালবিকা ত্বরিতগতিতে প্রস্থান করলেন। হতবুদ্ধি রাজা বিদূষককে প্রশ্ন করেন—'এখন কি কর্তব্য'? 'কি আবার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন'—বিদূষকের সহজ পরামর্শ। কিন্তু রাজাকে সে সুযোগ না দিয়েই আক্রমণের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসেন রাণী ইরাবতী। বাক্যবাণে জর্জরিত করে চলেন অগ্নিমিত্রকে, নিরুপায় রাজা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগটুকুও পাচ্ছেন না। অবশেষে ক্রুদ্ধা ইরাবতী আহতা ফণিনীর মতই রাজার সমস্ত অনুনয় আগ্রহ্য করে দর্পভরে স্খলিতবসনে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ইরাবতীর এই উগ্র অহমিকা, এমন কি রাজাকেও উপেক্ষা করার স্পর্ধা, মালবিকার প্রতি রাজার আকর্ষণকে আরও তীব্র করে তুললো।

অচিরে ইরাবতী সমস্ত ব্যাপারটি দেবী ধারিণীর কাছে নিবেদন করলেন। তখন রাজ্ঞীর নির্দেশে বকুলবালিকাসহ মালবিকাকে বন্দী করে রাখা হলো পাতালকক্ষে। দ্বাররক্ষিণীর কাছে তাঁর নাগমুদ্রা চিহ্নিত অংগুরীয়ক প্রদর্শন ব্যতীত মালবিকাকে মুক্ত করা চলবে না—এই ছিল তাঁর আদেশ। মালবিকা-বিহনে রাজার অবস্থা হয়ে উঠলো খুবই শোচনীয়। অবশেষে বিদূষক এক উপায় স্থির ক'রে ফেলে।

রাজা এসেছেন রাজ্ঞী ধারিণীর কুশলবার্তা জানার জন্যে—তখন

সহসা বিদূষক প্রবেশ করল, মুখে কাতর আর্তনাদ—'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আমাকে সর্প দংশন করেছে, দেবী দর্শনে আসার জন্য উপহারের উদ্দেশে উদ্যানে পুষ্প সংগ্রহের সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল।' স্বভাবতই বিদূষকের প্রতি রাজ্ঞীর সহানুভূতির উদ্রেক হলো। বিদূষকের অবস্থা ক্রমশ অবনতির পথে চলেছে দেখে তাকে বিখ্যাত বিষবৈদ্যের কাছে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পরে প্রতীহারী এসে জানায়—'বৈদ্য বিষ দূর করার জন্যে নাগমুদ্রা প্রার্থনা করেছেন।' কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এই মুদ্রা? অবশেষে নিরুপায় হয়েই রাণী বললেন—'আমার এই অঙ্গুরীয়কে সর্পমুদ্রা খচিত আছে—এইটি নিয়েই প্রয়োজন সিদ্ধ কর।' রাজার ইঙ্গিতে অল্পক্ষণ পরে প্রতীহারী ফিরে এসে ধারিণীকে অঙ্গুরীয়কটি প্রত্যর্পণ করে জানালো—'উদ্দেশ্য সিদ্ধ, বিদূষক আরোগ্যের পথে।' রাজা বুঝলেন বিদূষকের পরিকল্পনা অনুসারে স-সখী মালবিকা মুক্ত। মিলনোৎসুক রাজা কিছুক্ষণ পরেই উপস্থিত হলেন সেই সমুদ্র-গৃহে, যেখানে বকুলাবলিকাকে সঙ্গে নিয়ে মালবিকা প্রতীক্ষারতা।

সমুদ্রগৃহ—সরোবরের মধ্যস্থানে নির্মিত শান্ত-শীতল প্রমোদকক্ষ—ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত রাজা অগ্নিমিত্রের প্রেমবিলাসের চিত্র। সেই চিত্র দেখে মালবিকার চিত্ত উন্মনা। পার্শ্বে অঙ্কিত যে স্ত্রীমূর্তির প্রতি রাজা একাগ্রলোচন—কে সেই নারী? প্রশ্নের উত্তরে বকুলাবলিকা বলে ইনিই রাজার প্রিয়তমা মহিষী ইরাবতী, স্বভাবতই অপর নারীর প্রতি নায়কের আসক্তি দেখে নায়িকা-সুলভ প্রেমকোপ সূচিত হলো মালবিকার অন্তরে—তিনি স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যতা হতেই আত্মপ্রকাশ করলেন রাজা, সঙ্গে বিদূষক। মালবিকার অবস্থা 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। বকুলাবলিকা ও বিদূষক অন্তরালে গেলেন—রাজার সম্মুখে বিহ্বলা মালবিকা একা। এতদিনে বুঝি পূর্ণ হলো রাজার মনোরথ!

ঠিক সেই সময়েই ইরাবতী আসছিলেন সমুদ্রগৃহের দিকে, উদ্দেশ্য ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত রাজার চিত্রে প্রণাম করে রাজাকে অবহেলা করার পূর্ব অপরাধের স্খালন। দ্বারে প্রহরারত বিদূষক নিদ্রামগ্ন ; তাঁর নিদ্রাপ্রলাপ—'মালবিকা ইরাবতীকে অতিক্রম করিও।' কুপিত করে তোলে ইরাবতী ও তাঁর সখীকে। সখী নিপুণিকা ভয় দেখানোর জন্যে বিদূষকেরই বংশদণ্ডটি নিক্ষেপ করে তাঁর ওপর —চমকিত বিদূষক আর্তনাদ করে ওঠে। 'অবিহা, অবিহা, দব্বীকরো মে উপরিপরিপড়িতো।'—হায় হায়! সাপ কামড়ালো আমাকে। সচকিত হয়ে রাজা ছুটে আসেন—সর্প যদি রাজাকেও দংশন করে—এই আশঙ্কায় তাকে বাধা দেবার জন্যে ত্রস্তা মালবিকাও এগিয়ে আসেন ; বকুলাবলিকা তাঁদের অনুসরণ করে। বিদূষক এখন তাঁর ভ্রম বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হয়ে বলে—ও এটা আমারই লাঠি—আমি ভাবলাম, বুঝি মালবিকাকে মুক্ত করার প্রয়োজনে কেতকীর কাঁটায় আঙ্গুলে ক্ষত সৃষ্টি করে, রাজ্ঞীকে মিথ্যা সর্প দংশনের কথা বলে নাগমুদ্রা গ্রহণ করার অপরাধেই এই পরিণাম ঘটল।

সমস্ত গোপনতারই তখন অবসান হয়েছে। ইরাবতী সহসা রাজার সামনে এসে বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠেন—'অবি নিব্বিগ্‌ঘম-পোরহো দিবাসঙ্কেদো মিহুণস্স' ?—দিনের বেলায় অভিসার সার্থক হলো তো? সকলে স্তম্ভিত। রাজা ইরাবতীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন—কিন্তু বৃথা প্রয়াস। মালবিকা ভীরু কপোতীর মতই ভয়ত্রস্তা, রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সমস্ত পরিবেশটিতে যেন বজ্রপতনের বিহ্বলতা। সহসা প্রতিহারী এসে জানায় ক্রীড়ারতা রাজকন্যা বসুলক্ষ্মী একটি পিঙ্গল বানরের তাড়নায় ভীত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাজার সত্বর অন্তঃপুরে আসা প্রয়োজন। তখনকার মত সঙ্কটমুক্ত হলেন রাজা, ইরাবতীও বিদূষকসহ ব্যস্তভাবে রওনা দিলেন রাজ্ঞীর প্রাসাদকক্ষের দিকে। অজানিত লাঞ্ছনার আশঙ্কায়

ভয়কম্পিত চিত্তে মালবিকা অপেক্ষা করতে থাকেন। কয়েক মুহূর্ত গেল কেটে—শোনা গেল আনন্দকলরব, মালবিকার দোহদ দানের ফল ফলেছে—অশোকবৃক্ষ মঞ্জরিত। অতএব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজ্ঞী নিশ্চয় মালবিকার বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। আশা-নিরাশার দোলায় দোলে মন।

অবশেষে দেখা গেল একদিন মালবিকাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা করে দেবী ধারিণী পণ্ডিত-কৌশিকী ও অন্যান্য পরিজনসহ সেই প্রমোদ-উদ্যানেই এসেছেন—রাজাকেও জানিয়েছেন আমন্ত্রণ। কী তাঁর উদ্দেশ্য? সকলেই কৌতূহলী। রাজা এলেন বিদূষকসহ। ঋতু বসন্ত এখন পরিণতির পথে ; কাননভূমিতে তাই শুরু হয়েছে ফুলের সমারোহ —শুধু অকালকুসুমের শোভায় নয়নাভিরাম রূপ ধারণ করেছে রাজ্ঞীর প্রিয় রক্তাশোক বৃক্ষটি। সর্বোপরি সুশোভিতা মালবিকার বনলক্ষ্মীর মতই অপূর্ব সৌন্দর্য রাজার নয়নে মোহজাল বিস্তার করে। মিলনের কামনা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে, কিন্তু ধারিণীর উপস্থিতির বাধা রজনীতে চক্রবাকের মতই তাঁর বিরহ-যন্ত্রণাকে আরও দ্বিগুণিত করে তোলে। ইতিপূর্বে সংবাদ এসেছে—শত্রু বিদর্ভরাজ পরাজিত—ঐ বংশেরই এক রাজকুমার মাধবসেন, যিনি অগ্নিমিত্রের অনুগত ছিলেন ব'লে বন্দী হয়েছিলেন, তিনি মুক্ত, উপরন্তু পরাজিত রাজ্য থেকে বহু ধনরত্নসহ সংগীতশিল্পনিপুণা হু'টি কন্যাও এসেছে উপহারস্বরূপ। রাজার সম্মুখে তাঁদের আনা হলো। মালবিকাকে দেখে তারা যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অভিবাদন জানায় তারা মালবিকাকে। তাদের সসম্ভ্রম ভাব লক্ষ্য করে রাজা প্রশ্ন করেন—কে এই কন্যা? বালিকাদ্বয় জানাল, ইনিই বিদর্ভরাজ্যের অন্যতম উত্তরাধিকারী মাধবসেনের ভগিনী রাজকন্যা মালবিকা। মাধবসেন জ্ঞাতি শত্রুর দ্বারা বন্দী হলে মন্ত্রী সুমতি ও তাঁর ভগিনী পণ্ডিত-কৌশিকী অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিবাহদানের উদ্দেশ্যে এঁকে বিদিশায় আনছিলেন। কিন্তু তারপর কী হলো? রাজা ও

সমবেত সকলেই উৎসুক হয়ে ওঠেন। এগিয়ে আসেন পরিব্রাজিকা বেশধারিণী পণ্ডিত-কৌশিকী। তাঁর পরিচয়ও প্রকাশিত হয়ে পড়ল—ইনিই মন্ত্রী সুমতির ভগিনী। তিনিই বিবৃত করেন ঘটনার বাকী অংশটুকু। মালবিকাসহ বিদিশাভিমুখে আগমনকালে পথে তাঁরা দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। মালবিকাকে রক্ষার প্রয়াসে প্রাণদান করেন সুমতি। মালবিকা হন অপহৃতা। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পণ্ডিত-কৌশিকী মৃত ভ্রাতার সংকারের পর মালবিকার সন্ধানে যাত্রা করেন। বিদিশায় এসে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর বেশ ধারণ করেন—রাজ-অন্তঃপুরে এসে দেখা পেলেন মালবিকার—জানতে পারলেন, সীমান্ত দুর্গের সেনাপতি রাজ্ঞী ধারিণীর ভ্রাতা বীরসেন দস্যুদলের কবল থেকে মালবিকাকে মুক্ত করে ভগিনীর পরিচারিকারূপে প্রেরণ করেন বিদিশায়, মালবিকার প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যায়। কিন্তু পণ্ডিত-কৌশিকী সমস্ত ঘটনা এতদিন গোপন রেখেছিলেন কেন? রাজ্ঞীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন—মালবিকার পিতার জীবদ্দশায় জনৈক সন্ন্যাসী বলেছিলেন—'বৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতি'—'এক বৎসরের দাস্যবৃত্তির পর এই বালিকা যোগ্য পতি লাভ করবে।' সেই সময় এখন অতিক্রান্ত। দুঃখের অমানিশা অবসিত, সৌভাগ্যের সূর্য পূর্বাচলে। তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও আনন্দ-সংবাদ—কঞ্চুকীর আনীত পত্র পাঠ করে রাজা জানালেন—পুত্র বসুমিত্র যুদ্ধে শত্রুরাজগণকে পরাজিত করে যজ্ঞীয় অশ্বকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন, যজ্ঞের আয়োজন এখন সম্পূর্ণ। অনতিবিলম্বে সপরিবারে রাজা অগ্নিমিত্রের যাওয়ার প্রয়োজন—ঐ সংবাদ পাঠিয়েছেন পুষ্পমিত্র—যিনি সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং অগ্নিমিত্রের পিতা। পুত্র বসুমিত্রের বিজয়বার্তায় রাজ্ঞী হৃষ্টচিত্তে স্বামীকে বলেন—'ইমং অজ্জউত্তো পিঅণিবেদণাণুরুবং পরিতোসি অংগ পড়ীচ্ছদু'— 'যে প্রিয় সংবাদ জানালেন তার উপযুক্ত পারিতোষিক গ্রহণ করুন', এই বলে অবগুণ্ঠিতা

মালবিকাকে সমর্পণ করেন অগ্নিমিত্রের হস্তে। নায়ক-নায়িকার সুপ্রতীক্ষিত মিলন এতদিনে সাধিত হলো—নেমে এল নাটকের যবনিকা। দেবী ধারিণী যেন সেই সমুদ্রগামিনী বিশাল স্রোতস্বিনী, যে ক্ষুদ্র নদীগুলিকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে মিলিয়ে দেয় সাগরে। অন্যসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যদধিম্।

বিক্রমোর্বশীয়ম্

রাজা পুরূরবা সূর্যোপস্থান থেকে ফিরে আসছিলেন সূর্যবন্দনা সেরে—হঠাৎ শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠের মিলিত ক্রন্দনধ্বনি। সযত্ন অনুসন্ধানের পর জানলেন—অপ্সরা উর্বশী যখন কৈলাস পর্বত থেকে দেবপূজা সেরে ফিরছিলেন তখন 'কেশি' নামে এক দৈত্য সখী চিত্রলেখাসহ তাঁকে হরণ করেছে—তাই রম্ভা প্রমুখ সখীদের এই বিলাপ। তৎক্ষণাৎ পুরূরবা ধনুর্বাণ ধারণ করে দৈত্যরাজের অনুসরণে যাত্রা করলেন। অপ্সরারাও এখন আশ্বস্ত, কারণ রাজা পুরূরবার বীরত্ব সুবিদিত। তাঁর শৌর্যের জন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে এক সময় দৈত্যদের বিরুদ্ধে দেবসেনার নেতৃত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে সবাই পুরূরবার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনে চলে…। স্বল্প পরেই তিনি ফিরে এলেন—সঙ্গে ভীতিবিহ্বলা উর্বশী ও সখী চিত্রলেখা! পুরূরবার অসাধারণ বাহুবলেই সম্ভব হলো কেশির নিধন ও উর্বশীর পুনরুদ্ধার। অসামান্য রূপযৌবনবতী অপ্সরার কৃতজ্ঞ-দৃষ্টি রাজাকে স্পর্শ করে যায়—রাজার অন্তরও সেই অতুলনীয় লাবণ্য-শোভায় বিমুগ্ধ—প্রথম দর্শনেই প্রেম! পুরূরবার কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিনন্দন বহন করে আনেন গন্ধর্ব চিত্ররথ। তাঁর অভিনন্দনের উত্তরে পুরূরবা বলেন—'ইন্দ্রের প্রভাবের ফলেই এই দুরূহ কর্তব্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।' লক্ষণীয় পুরূরবার বিনয়প্রকাশ—'অনুৎসেকঃ খলু বিক্রমালঙ্কারঃ'—নম্রতাই তো শৌর্যের ভূষণ।

উর্বশীর কিন্তু আর সময় বাকি নেই—তাকে এবার ফিরে যেতে হবে স্বস্থানে—স্বর্গলোকে। সখীর মাধ্যমে রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যাত্রা করেন উর্বশী—কিন্তু মন তো সরে না! 'যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়।' ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাজার দিকে

বারবার ফিরে তাকাচ্ছেন তিনি--লতায় যেন জড়িয়ে গেল মুক্তাহারটি —ছাড়িয়ে নেওয়ার অবকাশে রাজার সঙ্গে আরেকবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়—প্রেমিকের চক্ষু সহজেই পড়ে নিতে পারে প্রেমের ভাষা! দু'জনের মনের বাসনা আর দু'জনের কাছে গোপন থাকে না—'উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে'!

উর্বশীর বিদায়ের পর পুরূরবার অবস্থা অত্যন্ত করুণ—রাজকার্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা—উদ্‌ভ্রান্তের মতই তিনি সেই নন্দনবাসিনীর জন্য হা-হুতাশ করে চলেন। এই অবস্থা দেখে বিদূষক তাঁকে নিয়ে আসেন প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রমোদোদ্যানে—লতামণ্ডপস্থ প্রস্তরাসনে দু'জনে উপবেশন করেন। ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে উদ্যানের শোভা অতি অপরূপ! কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উর্বশী বিহনে রাজার মনকে আরও আকুল করে তোলে! ওদিকে উর্বশীর কাছেও স্বর্গসুখ তুচ্ছ মনে হয়—রাজা পুরূরবার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর এতই প্রবল। অতএব স্বেচ্ছাবিহারিণী অপ্সরা স-সখী সেই উদ্যানেই চলে আসেন। তিরস্করিণী বিদ্যায় অদৃশ্য থেকে শুনতে থাকেন রাজার বিলাপ। অবশেষে তিনিও একটি ভূর্জপত্রে লিখে ফেললেন নিজের মনের কথা—সে'টি উড়ে এসে পড়ল রাজার সামনে। রাজা সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে দেখেন—উর্বশীর পত্র!

বিরহ-বিশীর্ণা উর্বশীর কাছে পারিজাত পুষ্পের কোমল শয্যা, নন্দনকাননের শীতল পবনও উষ্ণ বলে বোধ হচ্ছে—একথাই তিনি জানিয়েছেন ছন্দোবদ্ধ পদবন্ধে।

—একি, এ যে তাঁর মতই আকুলতা ফুটে উঠেছে প্রতি ছত্রে! বারবার পড়েও আশ মেটে না। অবশেষে ওটি সযত্নে রক্ষা করতে বলেন বিদূষককে।—এইবার অবসর বুঝে চিত্রলেখা তাঁর প্রতি উর্বশীর গভীর আকর্ষণের কথা প্রকাশ করলেন—কি এক দুর্লভ আশায় তাঁর হৃদয় কম্পিত—মেঘের আড়াল থেকে এবার বুঝি দেখা দেয় বিদ্যুৎ—কারণ 'প্রথমং মেঘরাজির্দৃশ্যতে—পশ্চাদ্বিদ্যুল্লতা।'

রাজার আশা পূর্ণ করে এবার স্বয়ং উর্বশীই আত্মপ্রকাশ করেন—উল্লাস ও বিস্ময়ে অভিভূত রাজা সাদরে নিজের পাশে বসালেন—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে কেটে যায় কয়েকটি মুহূর্ত !···!···! কিন্তু হরিষে বিষাদ। বহুবাঞ্ছিত মিলনক্ষণের স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প—নেপথ্য থেকে আদেশ ঘোষিত হয়—'স্বর্গসভায় দেবরাজ ইন্দ্র নাট্যগুরু ভরতের পরিচালনায় নাট্যাভিনয় দর্শন করবেন।' অতএব বিদায় নিতে হ'লো স্বর্গনটী উর্বশীকে কর্তব্যের ডাকে। রাজার সামনে এখন আবার শুধুই অতল বিরহ-পারাবার।

এই সঙ্কট-মুহূর্তেই পুরূরবাপত্নী কাশীরাজ-দুহিতা এসে উপস্থিত সেই প্রমোদোদ্যানে। বিদূষকের অসাবধানতায় সেই ভূর্জ-পত্রের লিখনটিও উড়ে গিয়ে পড়ে রানীর কাছে। বিদূষক যখন ও'টি খুঁজে পাওয়ার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত তখনই রাজ্ঞী বিদ্রূপ-কুটিল কণ্ঠে মহারাজকে বললেন—'এই যে আপনার সেই রাজকার্যের প্রয়োজনীয় ভূর্জপত্র !'—রাজা হতবাক্। বামাল ধরা পড়লে চোরের জবাব দেওয়ার আর কিই বা থাকে ! রাজা সত্য গোপনের প্রয়াস পেলেও রানীর কাছে সবকিছু দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। বিক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি চলে যেতে উদ্যত হতে রাজা অনুতপ্তভাবে তাঁর চরণ ধরে অনুনয় করতে থাকেন। অন্তঃপুর-বিপ্লবকে কোন্ সাহসী পুরুষই বা ভয় না করেন ! কিন্তু ক্রুদ্ধা, অপমানিতা রাজ্ঞী কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে সবেগে প্রস্থান করেন।

স্বর্গে অভিনীত হচ্ছে নাট্যাচার্য ভরত রচিত লক্ষ্মীর স্বয়ংবর নাটক। নাম ভূমিকায় স্বয়ং উর্বশী। কিন্তু অভিনয়ের মধ্যেই তিনি ঘটালেন প্রমাদ—কমলার বাঞ্ছিত পুরুষ রূপে পুরুষোত্তমের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বলে ফেললেন—'পুরূরবা'। নাট্যাচার্য এই ভ্রান্তির জন্যে বিরক্ত হয়ে অভিশাপ দিলেন—'স্বর্গভ্রষ্ট হও।' দেবসভায় লজ্জায় অপমানে নতশির উর্বশীকে দেখে দেবরাজের মনে সহানুভূতির সঞ্চার হ'লো—শাপের গুরুত্ব কিছু লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—

'উর্বশী এখন মর্ত্যে গিয়ে পুরূরবার সঙ্গে বাস করতে পারে, তবে পুত্রমুখ দর্শনের পর আবার তার স্বর্গবাসের অধিকার ফিরে আসবে।'

সন্ধ্যা সমাসন্না—পাখীরা ফিরেছে কুলায়ে—প্রদীপ জ্বলে উঠেছে ঘরে ঘরে—ধূপের ধোঁয়ায় প্রাসাদগুলি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রাজা দিনের কর্তব্য সমাধা করে এবার বিশ্রাম নেবেন—এমন সময় কঞ্চুকী সংবাদ আনে—'রাজ্ঞী ব্রতপালনের জন্যে চন্দ্র-রোহিণীর সংযোগ-মুহূর্ত পর্যন্ত রাজার সঙ্গে 'মণি-হর্ম্যে'র ওপর একত্র অবস্থানে ইচ্ছুক।' আসলে পায়ে ধরে সাধা সত্ত্বেও রাজাকে ইতিপূর্বে অবহেলা করে রানী এখন অনুতপ্ত—তাই রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই তাঁর এই প্রস্তাব। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সন্ধ্যার অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে রানীর নির্দেশিত স্থানে উপস্থিত হলেন রাজা পুরূরবা —বিদূষকসহ রানীর প্রতীক্ষা করতে থাকেন—কিন্তু তাঁর অন্তর এক মুহূর্তের জন্যেও উর্বশীর চিন্তা থেকে বিরত হতে পারছে না—বিদূষক তাঁকে আশ্বাস দিতে থাকেন—'উর্বশীর সঙ্গে আপনার মিলন ঘটবেই।'

এদিকে স্বর্গচ্যুতা উর্বশী সখী চিত্রলেখাসহ অভিসারিকার বেশে পুরূরবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন আকাশযানে। প্রাসাদশিখরে বিদূষকসহ উপবিষ্ট চিন্তামগ্ন রাজা ক্রমশ তাঁদের দৃষ্টিপথে এলেন—অন্তরাল থেকে তাঁরা দু'জনের কথাবার্তা শুনতে থাকেন। এই সময়ই রাজা সখার কাছে প্রকাশ করছিলেন উর্বশী-বিহীন তাঁর অবস্থার কথা —কুসুমশয্যা—চন্দ্রকিরণ—চন্দনের প্রলেপ—সুশীতল মণিরত্ন—কিছুই তাঁর দাহ জুড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়—সেই স্বর্গকন্যার জন্যে তাঁর বাসনা এতই গভীর।—এবার স্বয়ং রাজ্ঞী এসে উপস্থিত। অন্য নারীকে হৃদয় সমর্পণ করা সত্ত্বেও রাজা স্বাভাবিক আভিজাত্যে পত্নীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। প্রথমে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দানের পর প্রসাদী মিষ্টান্ন বিতরণ করে রানী লুটিয়ে পড়লেন রাজার

পায়ে—পতিপ্রাণা পত্নী স্বামীর প্রীতির জন্যে ঘোষণা করেন—'অদ্য প্রভৃতি যাং স্ত্রিয়মার্যপুত্রঃ প্রার্থয়তে, যা চার্যপুত্রস্য সমাগমপ্রণয়িনী, তয়া সহ ময়া প্রীতিবন্ধনেন বর্তিতব্যমিতি।' 'আজ থেকে যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করবেন বা যে নারী তাঁকে প্রার্থনা করবেন তাঁর সঙ্গে আমি প্রীতির সম্বন্ধই বজায় রাখব।'—উর্বশীর সঙ্গে মিলনের প্রধান অন্তরায় অপগত হলো রানীর সম্মতিতে। পত্নীর বিদায়-গ্রহণের পর রাজা আবার ডুবে যান উর্বশীর ভাবনায়—সহসা চোখের ওপর কার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শে চম্‌কে ওঠেন—কে যেন পেছন থেকে এসে তাঁর চোখ দু'টি চেপে ধরেছে! অভীষ্ট সেই স্পর্শ চিন্‌তে ভুল হয় না রাজার—সাদরে উর্বশীকে বসালেন নিজের আসনে —সঙ্গিনী চিত্রলেখা উর্বশীকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করে অনুরোধ জানালেন—'আপনার ব্যবহার যেন এঁকে স্বর্গ ও স্বজন-বিচ্ছেদের বেদনা ভুলিয়ে দিতে পারে।'—বাঞ্ছিতাকে লাভ করে ধন্য হলেন রাজা পুরূরবা—চিত্রলেখা বিদায় নিলেন।

মিলনসুখী দম্পতী নানাস্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন—অবশেষে তাঁরা উপস্থিত হ'ন গন্ধমাদন অরণ্যে,—আনন্দে দু'জনে নন্দনবনে বিহার করছিলেন—কিন্তু তাঁদের সুখের নির্মল আকাশে ঘনিয়ে এলো দুঃখের কালো মেঘ। মন্দাকিনী তীরে এক বিদ্যাধর-কন্যার দিকে পুরূরবা দৃষ্টিপাত করেছেন—এই অপরাধে অভিমানক্ষুব্ধা উর্বশী তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ঢুকে পড়েন কুমার কার্ত্তিকেয়ের সংরক্ষিত অরণ্যে। নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এই অঞ্চলে—ফলে উর্বশী পরিণত হলেন এক 'শ্যামকান্তিময়ী' লতায়। আর পুরূরবার অবস্থা? তিনি উন্মাদের মতই খুঁজে বেড়াচ্ছেন হারানো প্রিয়াকে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে—সর্বত্রই যেন তিনি দেখছেন তাঁর প্রেয়সীর ছায়া! আকাশে দেখা দিয়েছে ঘন মেঘ—তার ফাঁকে বিজলীর ছটায় বুঝি উর্বশীরই দিব্য কান্তি ঝল্‌সে উঠ্‌ছে! জলসিক্ত রক্তবর্ণ কদলীপুষ্প তো নয়—এ বুঝি উর্বশীরই অভিমানরক্তিম সজল আঁখি। মানস-

সরোগামী হংসকুলের কলধ্বনিতে যেন বেজে চলেছে তাঁরই নূপুর-নিক্কণ !—কিন্তু কোথায় উর্বশী ! এ-সবই তো রাজার ভ্রমমাত্র !—নিজের দুর্ভাগ্যকে দায়ী করে বিলাপ করতে থাকেন তিনি—হঠাৎ দেখতে পেলেন সামনে পড়ে আছে রক্তবর্ণের উজ্জ্বল এক রত্নখণ্ড—নেপথ্য থেকে শোনা গেল কোনো ঋষির আদেশবাণী—'বৎস, গ্রহণ কর এই সঙ্গমমণি, এর দ্বারাই বাঞ্ছিত মিলন সাধিত হবে।' সাগ্রহে সংগ্রহ করেন রাজা মণিটি—অরণ্যের আরও দুর্গম অঞ্চলে প্রবেশ করেন হারানো প্রিয়ার অনুসন্ধানে।—একটি অপরূপ লতা-মূর্তির সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন রাজা—'কি অপূর্ব শোভা এই লতাটির —এর অঙ্গে অঙ্গে যেন উর্বশীরই দেহলাবণ্য ! নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরেন লতাটিকে—আবেশে তাঁর চক্ষু মুদ্রিত।—এ যেন প্রিয়তমার উষ্ণ কোমল দেহের স্পর্শ ! কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়——চোখ খুলেই রাজা স্তম্ভিত।—স্বয়ং উর্বশী তাঁর বক্ষোলগ্না। সঙ্গমমণির সংস্পর্শেই 'কুমারবনে' অনধিকার-প্রবেশের অভিশাপ দূর হলো—উর্বশী দেহ ফিরে পেলেন।—সব ভুল বোঝাবুঝির অবসানের পর দু'জনে যাত্রা করলেন রাজধানীর উদ্দেশ্যে।

রাজা পুরূরবা এবার রাজকার্যের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। একদিন প্রাতঃস্নানের পর প্রসাধনের সময় সঙ্গমমণিটি আনা হচ্ছিল তাঁর ধারণের জন্যে—এমন সময় এক লুব্ধ শকুনি রক্তবর্ণ মণিটিকে মাংসখণ্ড মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে চলে গেল বহুদূরে—রত্নটি উদ্ধারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। সকলেই যখন নিরাশ হয়ে পড়েছে তখন ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা—কোনো অজ্ঞাতনামা তীরন্দাজের তীরবিদ্ধ হয়ে মণিসহ পাখীটি পড়ে গেল ভূমিতে। রাজার লোকেরা তীর ও মণিটি নিয়ে আসে রাজার কাছে। তীরের পেছনে লেখা নাম—'ঐল বা পুরূরবার পুত্র আয়ুস্'—সকলেই বিস্মিত ! এই সময় এক সন্ন্যাসিনী একটি বালককে নিয়ে উপস্থিত। পুরূরবার অন্তর বাৎসল্যে ভরে ওঠে এই অজ্ঞাতপরিচয় বালককে দেখে—তাঁর নিজের

সঙ্গে কী অদ্ভুত সাদৃশ্য! ধীরে ধীরে তাপসী পরিচয় প্রকাশ করেন—জন্মদানের পর উর্বশী সন্তানকে ঋষির আশ্রমে এই তাপসীর তত্ত্বাবধানেই রেখে আসেন—কারণ ইন্দ্রের আদেশ ছিল রাজা পুরূরবা পুত্রমুখ দর্শন করলেই উর্বশীকে ফিরে যেতে হবে স্বর্গে। পাছে পুরূরবার বিরহ সহ্য করতে হয়—তাই এই ছলনা। উর্বশী সাধারণ মানবী নন, দৈবী ক্ষমতার বলে সন্তানলাভের ব্যাপারটি তিনি অনায়াসে পুরূরবার কাছে গোপন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত গোপনতা রক্ষা করা গেল না—তীরটির মাধ্যমে ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অতএব আবার হরিষে বিষাদ! পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দকে ছাপিয়ে উঠ্‌ল আসন্ন প্রিয়া-বিচ্ছেদের বেদনা। শান্ত পদক্ষেপে অশ্রুসজলনেত্রে প্রবেশ করেন উর্বশী—এবার এসেছে তাঁর বিদায়ের লগ্ন, কারণ রাজা এখন পুত্রমুখ দর্শন করেছেন। পুত্র আয়ু সাগ্রহে জনক-জননীর চরণ বন্দনা করে। কিন্তু পুরূরবার দুঃখের বুঝি তুলনা নেই—এ যে সব পেয়েও হারানো। জীবনপাত্র যখন কানায় কানায় পূর্ণ হতে চলেছে তখন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ।

ঠিক এই সময়েই ঋষি নারদ স্বর্গ থেকে এসে উপস্থিত—না জানি স্বর্গ থেকে আবার কোন্ বার্তা বয়ে আন্‌লেন। দেবর্ষি আবার ইন্দ্রের সংবাদ জানালেন—দস্যুদলনের প্রধান সহায় রাজা পুরূরবার মনস্তাপ ঘটাতে দেবরাজ অনিচ্ছুক, অতএব যতদিন ইচ্ছা উর্বশী সপুত্র রাজার কাছে থাক্‌তে পারেন। শুধু তাই নয়, পুত্র আয়ুর অভিষেকের উপযুক্ত আয়োজন-উপহারও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব সমস্যার সমাধান হলো। নারদ কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে গুরুজনদের প্রণাম জানালেন কুমার আয়ু। রাজপরিবারের জয়গানে মুখর হয়ে উঠ্‌ল চারিদিক্।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

মৃগয়াবিলাসী রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এক ধাবমান হরিণকে অনুসরণ করে বহুদূর চলে এসেছেন—সঙ্গের লোকজন সব পিছনে পড়ে গেছে। সারথি ক্রমশঃ রথের বল্গা ছেড়ে দেয়—বায়ুবেগে ছুটে চলে রথ—এবার বাণের নাগালের মধ্যে পেয়েছেন হরিণটিকে—তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হতেই শোনা গেল সাবধান-বাণী—'...আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ'—'মারবেন না, মারবেন না এই আশ্রমমৃগকে।'—এগিয়ে আসেন তাপসেরা, তাঁরা বলেন—'তুলারাশিতে অগ্নিসংযোগের মতই এই কোমল মৃগদেহে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করা উচিত নয়'। তপস্বীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজা তৎক্ষণাৎ বাণ সংবরণ করেন ; এঁদের কাছ থেকে জানা গেল—এখানেই মালিনী নদীর তীরে ঋষি কণ্বের আশ্রম। তিনি কন্যাকে অতিথি পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পণ করে সবেমাত্র সোমতীর্থে গেছেন কন্যারই মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে। তপোবনে আতিথ্য গ্রহণের জন্যে রাজাকে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন যজ্ঞীয় সমিধ্ সংগ্রহের প্রয়োজনে।

রথ ও রাজসজ্জা দূরে রেখে নম্রভাবে তপোবনে প্রবেশ করেন রাজা দুষ্যন্ত—প্রথমেই দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হলো—এই লক্ষণ তো পত্নীলাভের সূচক! কিন্তু ব্রহ্মচর্য যেখানে অবশ্য পালনীয় সেই তপোবনে এই লক্ষণ ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?—'ইদো ইদো সহীও'—'এই যে এইখানে সখি'! কাছেই যেন নারীকণ্ঠের আহ্বান শোনা যাচ্ছে! কৌতূহলী হয়ে উঠ্লেন রাজা—গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে পেলেন—রূপ-লাবণ্যময়ী সমবয়সী তিনটি তরুণী আশ্রম-তরুর আলবালে জলসেচনে ব্যস্ত। গোপনে

শুনতে থাকেন তাদের আলাপ—প্রথম সখী বলে—পিতা কণ্বের কাছে কন্যা শকুন্তলার চেয়ে আশ্রমবৃক্ষগুলি নিশ্চয় প্রিয়তর—নাহলে কি আর কুসুমকোমলা তোমাকে এই জলসেচনের মত কাজে নিযুক্ত করে যান ?

—'না, না, অনসূয়া, শুধু এজন্যেই নয়, আমিও তো এদের সহোদরের মতই দেখি'। রাজা বুঝতে পারেন ইনিই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা। সত্যিই, এই সুকুমারতনু তরুণীকে কঠোর আশ্রমধর্ম পালনে নিযুক্ত করে ঋষি যেন পদ্মের পাপড়ি দিয়ে শমীগাছের শক্ত ডাল কাটবার চেষ্টা করছেন। এই তপোবন-কন্যার অপরূপ তনুশ্রী রাজাকে মুগ্ধ করে—শৈবালযুক্ত কমলিনীর মত, কলঙ্কবিভূষিত চন্দ্রের মত বল্কলবসনা শকুন্তলার দেহকান্তি যেন আরও নয়নাভিরাম হয়েছে! নবযৌবনবতী শকুন্তলা পুষ্পিতা লতার মতই মনোরম। জলদানের সময় লতা থেকে একটি ভ্রমর তাঁর মুখের দিকে উড়ে আসতে থাকে —অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই তাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না দেখে ব্যতিব্যস্ত শকুন্তলা বলে বসেন—'আমাকে এই দুষ্ট মধুকরের হাত থেকে রক্ষা কর।' সখীরা পরিহাস করে বলে—'দুষ্টের দমনকর্তা রাজা দুষ্যন্তকে ডাক'। রাজা বুঝতে পারেন—আত্মপ্রকাশের পক্ষে এইটিই উপযুক্ত সময়। বীরদর্পে এগিয়ে এসে তিনি বলেন—'পুরু-বংশীয় রাজার শাসন সত্ত্বেও কোন্ দুর্বিনীত অবলার উপর অত্যাচারের স্পর্ধা রাখে!'—সহসা এক অপরিচিত আগন্তুকের আগমনে সখীরা চমকিত—অনসূয়া জানায়—'অন্যকিছু নয়, ভ্রমরের উপদ্রবই এই কাতরতার কারণ'। কিন্তু কে এই রূপবান্ অথচ গম্ভীরাকৃতি পুরুষ? অতিথিকে অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজনের জন্যে শকুন্তলাকে কুটিরে পাঠাতে চায় সখীরা—কিন্তু ইতিপূর্বেই শকুন্তলার লাবণ্যে রাজা বিমুগ্ধ —শকুন্তলাও এই আগন্তুকের দর্শনমাত্রেই 'তপোবন-বিরোধী বিকার' প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব রাজার আগ্রহে সকলেই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণ বৃক্ষের বেদিকাতে উপবেশন করেন। এবার সখীরা সসম্ভ্রমে আগন্তুকের

পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন—দুষ্যন্ত নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে জানালেন—পৌরব রাজা কর্তৃক তিনি শাসনকার্যে নিযুক্ত ; আশ্রম-জীবন নির্বিঘ্ন কিনা জানার জন্যই তাঁর আগমন। ইতিমধ্যে শকুন্তলার শৃঙ্গারসূচক হাবভাব সখীদের পরিহাসপ্রবণ কোরে তোলে—তারা বলে —'ঋষি কণ্ব আজ যদি আশ্রমে উপস্থিত থাকতেন তা হলে এই বিশিষ্ট অতিথিকে নিজের জীবনসর্বস্ব দান করতেও বিমুখ হতেন না'। রাজার মনেও শকুন্তলা সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাস্য—'ঋষি কণ্ব তো আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী, তবে শকুন্তলার জন্ম কিভাবে সম্ভব হলো ?'

অনসূয়া শকুন্তলার জন্মকাহিনী বিবৃত করে বলে—'রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপশ্চর্যা শুরু করায় উদ্বিগ্ন দেবতারা যথারীতি তপোভঙ্গের জন্যে অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন—এঁদেরই কন্যা শকুন্তলা—জন্মের পর পরিত্যক্ত হ'লে ঋষি কণ্বই পালন করেছেন।'

—কিন্তু এঁকে কি ঋষি ব্রহ্মচর্যেই দীক্ষিত করবেন, না বিবাহ দেবেন ? সখীরা জানায়—'সুপাত্রে কন্যাদানই ঋষির অভিপ্রেত'। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন দুষ্যন্ত—তা'হলে অপ্সরাকন্যা শকুন্তলাকে পত্নীরূপে কামনা করায় কোনো নীতিগত বাধা নেই ! সখীদের উক্তিতে কৃত্রিম কোপে শকুন্তলা যখন চলে যেতে উদ্যত, সখীরা তখন তাকে জোর করে ধরে রাখে—প্রিয়ংবদা বলে—'আমার কাছে তোমার দু'টি গাছে জল দেওয়ার ঋণ আছে—আগে নিজেকে ঋণমুক্ত কর—তারপর যেতে পাবে।' অদর্শনের আশঙ্কায় দুষ্যন্ত নিজ অঙ্গুরীয়ক দানে পরিশ্রান্তা শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করতে চাইলেন। এই অঙ্গুরীয়কে উৎকীর্ণ রাজা দুষ্যন্তের নাম দেখে সকলে বিস্মিত। সত্য গোপনের জন্যে রাজা তাড়াতাড়ি বলেন—'অন্য কিছু চিন্তার কারণ নেই, এটি মহারাজকর্তৃক প্রদত্ত।' কিন্তু তাঁর এই গোপনতা রক্ষার প্রয়াস বোধহয় সফল হ'লো না। প্রিয়ংবদা বলে—'শকুন্তলে, তুমি তাহলে এই মহাশয়, অথবা স্বয়ং মহারাজের দ্বারাই ঋণমুক্ত হলে।' বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না এই মধুর আলাপের অবসর—নেপথ্য থেকে

ঘোষণা শোনা গেল—'মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্তের সসৈন্যে আগমনে আশ্রমে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে—দন্তে লগ্ন ভগ্ন বৃক্ষশাখা ও পদতলে আবদ্ধ ছিন্ন লতাপাশসহ এক মত্ত মাতঙ্গ দানবের মতই আশ্রমজীবন লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে সবেগে এগিয়ে আসছে···।' বাধ্য হয়েই সসখী শকুন্তলাকে কুটিরের দিকে ফিরে যেতে হয়। রাজাও আশ্রমের শান্তিভঙ্গ না করার জন্যে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সংযত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। যাওয়ার সময় শকুন্তলা—পায়ে কুশের কাঁটা ফুটেছে এই অজুহাতে, কখনও বা গাছের ডালে জড়িয়ে-যাওয়া বল্কল মুক্ত করার ছল করে পিছন ফিরে রাজার দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। কর্তব্যের আহ্বানে রাজাকেও বিপরীত দিকে যেতে হয়। কিন্তু মন চলে যেতে থাকে শকুন্তলার উদ্দেশ্যে।

রাজবয়স্য বিদূষক অরণ্যজীবনে অস্থির হয়ে উঠেছে—বন্যজন্তুদের সঙ্গে বিচরণ, অনিয়মিত আহার-নিদ্রা তার আর সহ্য হচ্ছে না। তাই রাজাকে আসতে দেখে তাঁর করুণা উদ্রেকের জন্যে হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ায় শরীর বাঁকা হয়ে গেছে—এইরকম ভাণ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা এসে তার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করামাত্র সে রাজাকেই দায়ী করে—মৃগয়ার জন্যে ঘুরে ঘুরেই তার এই অবস্থা। তাকে আশ্বাস দিলেন রাজা—মৃগয়া আপাতত পরিত্যক্ত হ'লো। মৃগয়ার ব্যবস্থাপক সেনাপতিকে ফিরে যেতে হয় ক্ষুণ্ণ মনে; বিদূষক অবশ্য এই সিদ্ধান্তে খুবই আনন্দিত। এবার নিভৃতে বিদূষকের কাছে দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করে বলেন—বিধাতা যেন প্রথমে ছবি এঁকে নিয়ে পরে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন—কিংবা সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমার পর শ্রেষ্ঠ নারীসৃষ্টি রূপে এই মানসী প্রতিমাকে গড়ে তুলেছেন।···অনাঘ্রাত পুষ্পের মত, অনাস্বাদিত মধুর মত, অনাবিদ্ধ রত্নের মত, পুণ্যের অখণ্ড ফলের মতই ইনি এখনও পবিত্র কৌমার্যে অধিষ্ঠিতা। না জানি কোন্ ভাগ্যবান্ বিধির বিধানে এঁকে লাভ করতে সমর্থ হবে! কিন্তু রাজার প্রতি শকুন্তলার

মনোভাব কি? বিদূষকের প্রশ্নের উত্তরে রাজা শকুন্তলার সব হাবভাব লীলা চাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ করে বলেন। সব শোনার পর বিদূষকের মন্তব্য: 'তবে আর কি, তপোবন তো উপবনে পরিণত হয়ে গেল'। তাঁদের এই কথাবার্তার মধ্যেই রাজমাতার আদেশ নিয়ে রাজধানী থেকে হঠাৎ দূত উপস্থিত—'পুত্রপিণ্ড-পালন ব্রতের উদ্‌যাপনের দিন অবশ্যই পুত্র দুষ্যন্তকে রাজধানীতে উপস্থিত থাকতে হবে।'—রাজার এখন উভয়সঙ্কট—একদিকে শকুন্তলার আকর্ষণ, অন্যদিকে মাতৃআজ্ঞা! অনেক চিন্তার পর তিনি সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন—'সখা বসন্তককে তো মা পুত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন'। অতএব 'সখা, তুমিই তবে মাতৃক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে যাত্রা কর—আমাকে যাগযজ্ঞের বিঘ্ন দূর করে আশ্রমের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে।' ইতিপূর্বে কণ্ব-শিষ্যরা এসে রাক্ষসদের হাত থেকে যজ্ঞ-রক্ষার আবেদন জানিয়ে গিয়েছিল। রাজভ্রাতার উপযুক্ত সম্মানে সমস্ত সৈন্যদলসহ বিদূষক রওনা হ'লো রাজধানীর দিকে। পাছে শকুন্তলার কথা বিদূষক অন্তঃপুরে ব'লে বসে এই আশঙ্কায় রাজা যাওয়ার আগে তাকে সাবধান করে দিলেন—'...পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।' 'শকুন্তলার বিষয় সম্পূর্ণ পরিহাস করে বলেছিলাম; সত্যি ব'লে মনে কোরো না।' বিদূষকও একথাই স্বীকার করে নিয়ে হৃষ্টমনে রওনা হ'লো। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেন দুষ্যন্ত—শকুন্তলা ব্যাপারে মনোনিবেশের এখন অবাধ অবকাশ।

দুষ্যন্তের শক্তিপ্রভাবে তপস্যা-বিঘ্নকারী অরণ্যচরেরা দূরীভূত—আশ্রমকার্য নির্বিঘ্ন হওয়ায় তাপসেরা সন্তুষ্ট; কিন্তু শকুন্তলাকে না পাওয়া পর্যন্ত দুষ্যন্তের মনে শান্তি নেই। বাঞ্ছিতার দর্শনলাভের আশায় তাঁর অন্তর আগ্রহে অধীর! কোথায় গেলে পাওয়া যাবে প্রিয়তমার সান্নিধ্য! নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে মালিনী নদীর তীরে লতাকুঞ্জের শীতল পরিবেশে তাঁর অবস্থান সম্ভব—অতএব দুষ্যন্ত ঐ দিকেই অগ্রসর হলেন। ভুল হয়নি তাঁর অনুমান—লতাকুঞ্জের পথে পায়ের

চিহ্ন—এগিয়ে চলেন রাজা। সার্থক তাঁর প্রয়াস—কুঞ্জের অভ্যন্তরে শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠের আলাপ। উৎসুক রাজা কান পাতলেন—মদনবাণে আহতা নায়িকার অবস্থাও শোচনীয়—পদ্মের মৃণাল, চন্দনের অনুলেপন, তালপত্রের বীজন—কোনো কিছুই তাঁর বিরহতাপ দূর করতে পারছে না—সখীরা বিমূঢ়—কি করা যায়? একমাত্র বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনেই এই ক্লেশ দূর করা সম্ভব। অতএব সখী পরামর্শ দেয়—'···চিন্তেহি দাব কিম্পি ললিঅ-পদ-বন্ধণং···'। 'নিজের অবস্থা বর্ণনা করে সুন্দর পদবন্ধ রচনা কর—আমরা সেটি আশ্রমের আশীর্বাদী নির্মাল্যের সঙ্গে রাজার কাছে পৌঁছে দেব।' কোমল পদ্মপাতায় নখরচিহ্নে লিখলেন শকুন্তলা—'হে নিষ্ঠুর, তোমার অন্তর আমার অজ্ঞাত, কিন্তু তোমাতে সমর্পিতপ্রাণ আমাকে কামদেব উত্তাপে অভিভূত করেছেন···।' রাজা আর অন্তরালে থাকতে পারেন না। এগিয়ে এসে বলেন—'অয়ি সুতনুকে, কামদেব তোমাকে যদি শুধুমাত্র উত্তপ্ত করে থাকেন তো আমাকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করে ফেলেছেন।' প্রার্থিত জন সামনে উপস্থিত! সখীরা হৃষ্ট; শকুন্তলাও উঠে বসে শিষ্টাচার প্রদর্শনের প্রয়াস করেন, কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে তাঁকে নিষেধ করে পাশেই শিলাতলে রাজা উপবেশন করেন। সখীরা এবার শকুন্তলার মানসিক অবস্থা রাজাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন—'আপনার চিন্তাতেই সখীর এই দশা।···রাজারা সাধারণতঃ বহুপত্নীক, কিন্তু আমাদের সখী যেন আত্মীয়দের দুঃখের কারণ না হন—সেই ব্যবস্থা করুন···।' রাজা তাদের আশ্বস্ত করে বলেন—'আমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ দু'টি—এক সমুদ্রমেখলা বসুমতী, অপরা শকুন্তলা।' নিশ্চিন্ত মনে সখীরা রাজার কাছে সলজ্জা শকুন্তলাকে রেখে হরিণীর সন্ধানের ছলনায় বিদায় নিল। ব্রীড়াবনতা শকুন্তলা অসহায়া, কিন্তু স্বয়ং পৃথিবীশ্বর তো তাঁর কাছে উপস্থিত! শকুন্তলা চলে যেতে চান—কিন্তু রাজা তাঁকে বাধা দিলেন—বলপ্রয়োগের আশঙ্কায় সন্ত্রস্তা শকুন্তলা বলে ওঠেন—পৌরব, অসংযম প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ

আমি অভিভাবকের অধীন। কিন্তু রাজা গান্ধর্ব বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁর দৃঢ়তা দূর হয়—বাধাদানের দুর্বল প্রয়াস সত্ত্বেও ধীরে ধীরে রাজা তাঁর আনন উন্নমিত করেন—শকুন্তলার অধরমধুপানে উদ্যত হতেই নেপথ্য থেকে ভেসে এলো সখীদের কণ্ঠ—'হে দুঃখিনি চক্রবাকি, চক্রবাককে এখন বিদায় জানাও, রাত্রি সমাগত।' শকুন্তলা বুঝতে পারেন সখীদের সাবধানবাণী। ত্রস্তে দুষ্যন্তকে জানালেন—'আর্যা গৌতমী আমার শারীরিক অবস্থা জানার জন্যে এইদিকেই আসছেন—অতএব আপনি লতাকুঞ্জের আড়ালে আত্মগোপন করুন।' নিরুপায় রাজাকে সেইভাবেই লুকিয়ে পড়তে হ'লো। তাপসী গৌতমী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সহ প্রবেশ করে কুশল প্রশ্ন করেন—পবিত্র শান্তিজল ছিটিয়ে দেন শকুন্তলার অঙ্গে। সন্ধ্যা আসন্ন, অতএব তাঁর আদেশে সকলকেই কুটিরের দিকে রওনা হতে হয়। শকুন্তলা যেন লতাকুঞ্জের উদ্দেশ্যেই তাঁর বিদায়বাণী জ্ঞাপন করেন—'হে শান্তিপ্রদ লতাকুঞ্জ, আবার তোমার সঙ্গসুখ লাভ করার আশায় রইলাম।'

অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন দুষ্যন্ত—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'—অভীষ্টপ্রাপ্তির বাধা অনেক। লতাগৃহের চারিদিকে প্রিয়ার স্মৃতি—দলিত পুষ্পশয্যা, ছিন্নমৃণালবলয়—পদ্মপত্রের লিখন—তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করে তোলে। কিন্তু আবার আসে কর্তব্যের আহ্বান—নেপথ্য-বাণী থেকে জানা গেল—'সান্ধ্য হোমবিধি শুরু হওয়া মাত্রই উৎপীড়ক রাক্ষসদের গতায়াত লক্ষ্য করা যাচ্ছে।' অতএব যজ্ঞবাধা দূর করার প্রয়োজনে রাজাকে তৎপর হতে হ'লো।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে—রাজা ফিরে গেছেন রাজধানী। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় পরেও শকুন্তলার খোঁজ নিতে রাজধানী থেকে কোনো দূত আসেনি। স্বামীর চিন্তায় তিনি সর্বদাই অন্যমনা। এমন সময় ঘটে এক অঘটন—পূজার পুষ্পচয়নে ব্যস্ত সখীরা দূর থেকে শুনতে পেল ক্রুদ্ধ অভিশাপবাণী—'রে অতিথির অবমাননাকারিণি! যাঁর চিন্তায়

আমার মত তপোনিধির উপস্থিতিও অগ্রাহ্য কর্‌লি, উন্মত্ত ব্যক্তির পূর্বকথা মনে করিয়ে দিলেও সে তোকে চিনতে পারবে না।' —আকাশ ভেঙে পড়ল সখীদের মাথায়—দুর্ভাগিনী শকুন্তলার একি বিপত্তি! প্রিয়ংবদা দৌড়ে এসে কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার পায়ে পড়ে। অনেক অনুনয়ের পর ঋষি শুধু এইটুকু আশ্বাস দিলেন, 'যে-কোনো নিদর্শনদেখাতে পারলে তবে শাপের প্রভাব দূর হবে।' কিছুটা আশ্বস্ত হ'লো সখীরা, কারণ রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক তো আছে শকুন্তলার কাছে—রাজধানীর উদ্দেশ্যে বিদায়গ্রহণের সময় দুষ্যন্ত এইটি শকুন্তলাকে পরিয়ে ব'লে গিয়েছিলেন—'এখানে উৎকীর্ণ আমার নামের অক্ষর গণনা করতে থাক, যেদিন গণনা শেষ হবে সেদিন রাজধানী থেকে তোমার জন্যে লোক এসে পৌঁছবে।' এই অঙ্গুরীয়কটি ভবিষ্যতে স্মারকচিহ্ন হবে—এই ভেবে নিশ্চিন্ত সখীরা স্থির করলেন—অভিশাপের কথা জানিয়ে দুঃখিনী শকুন্তলার দুঃখ আর বাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। অতএব শকুন্তলার অজ্ঞাতেই ঘটে গেল অভিশাপ-সংক্রান্ত ব্যাপারটি।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে অগ্নিগৃহে দৈববাণীর মাধ্যমে ঋষি কণ্ব জানতে পারলেন—শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা ও অন্তঃসত্ত্বা। অতএব তাপসী গৌতমী ও শাঙ্গরব-শারদ্বত দুই শিষ্য সহ তিনি কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণের আয়োজন করলেন। সখীরা সাজিয়ে দেয় শকুন্তলাকে—অরণ্যদেবতাদের প্রদত্ত ক্ষৌমবস্ত্রে—আভরণে। বিদায়ের পূর্বে আশ্রমবাসীরা আশীর্বাদ করেন শকুন্তলাকে। এবার পিতা কণ্বকে প্রণাম জানান শকুন্তলা—আশীর্বাদ করেন ঋষি—'যযাতির পত্নী শর্মিষ্ঠার মত স্বামীর আদরণীয় হও, পুরুর মত চক্রবর্তী পুত্রলাভ কর।'—সমস্ত আশ্রম-তরুর কাছে তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন—'তোমাদের জল না দিয়ে যে জলগ্রহণ করত না, ভূষণপ্রিয়তা সত্ত্বেও যে তোমাদের পত্রপল্লব ছিন্ন করতে অনিচ্ছুক, তোমরা কুসুমিত হ'লেই যা'র আনন্দ, সেই শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুমোদন কর।'

ভেসে এলো কোকিলের কুহুধ্বনি—এ যেন তরুদেরই স্বীকৃতি। —এগিয়ে আসে বিদায়ের লগ্ন—সখীরা তো কেঁদেই আকুল। সমস্ত তপোবন-প্রকৃতিও যেন দুঃখে মুহ্যমান। হরিণের মুখ থেকে খসে পড়ছে দর্ভতৃণের গ্রাস—ময়ূর ভুলেছে তার নৃত্য—লতারা যেন শুষ্ক পত্র বিমোচনের ছলে অশ্রুবিসর্জন করছে। যে লতাটিকে পরম স্নেহে লালন করে 'বনজ্যোৎস্না' নাম দিয়ে সহকারের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন—সেই লতা-ভগিনীর কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করেন শকুন্তলা। কিন্তু পেছন থেকে কে তাঁর আঁচল ধরে আকর্ষণ করে! থম্‌কে দাঁড়ান তিনি—আর কেউ নয়, এ সেই মাতৃহীন হরিণশিশু, যাকে সন্তানস্নেহে পালন করেছিলেন! সকলের দৃষ্টিই বাষ্পরুদ্ধ! কিন্তু আশ্রমিকদের আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া চলে না; কণ্ব বিদায়ের আগে রাজার উদ্দেশ্যে শিষ্যদের তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিলেন—'মুনি-দের সংযম, নিজের উচ্চবংশ, শকুন্তলার প্রতি আপনার স্বত-উৎসারিত ভালবাসা—এসব কথা মনে রেখে শকুন্তলাকে অন্তঃপুরে পত্নীত্বের স্বাভাবিক মর্যাদা দান করা আপনার কর্তব্য। এর চেয়ে বেশী কিছু বধূর আত্মীয়দের বলা অশোভন—কারণ তা ভাগ্যায়ত্ত।' শকুন্তলাকেও উপদেশ দিলেন স্বামিগৃহের কর্তব্য সম্বন্ধে—'গুরুজনদের সেবা করবে—সপত্নীদের সঙ্গে সখীসুলভ আচরণ করবে—স্বামী ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর বিরোধিতা করবে না—এইভাবে যুবতীরা গৃহিণীত্ব লাভ করে—বিরুদ্ধচারিণীরা কুলের কণ্টক।'···কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না —জলাশয়ের কাছে এসে পড়েছেন—এই পর্যন্তই আসা চলে——শিষ্যেরা একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন কন্যা-বিচ্ছেদ দুঃখে ম্রিয়মাণ ঋষি—শকুন্তলাকে বিদায় আলিঙ্গন জানিয়ে এবার অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে নিয়ে ফিরে আসতে হবে আশ্রমে—এদেরও পাত্রস্থ করার দায়িত্ব আছে। আশ্রমবিয়োগবিধুরা শকুন্তলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন—আবার কবে পিতার কাছে আশ্রমে ফিরে আসার সুযোগ ঘটবে? কণ্ব জানালেন—রাজ্ঞীর কর্তব্য সম্পাদনের পর

পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে আবার স্বামিসহ তপোবনে প্রত্যাগমন সম্ভব হবে। সজল নয়নে শকুন্তলাকে বিদায় নিতে হয় এতদিনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে এক অজানার উদ্দেশ্যে—সতৃষ্ণ নয়নে বার বার ফিরে তাকান! দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় বন্ধুর ভূমিতে আঘাত পেতে পারেন—সাবধান করে দেন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা। ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে যায় শকুন্তলা ও তার অনুগামীরা—সখীরা নির্নিমেষে চেয়ে থাকে তাঁর পথপানে—যতক্ষণ দেখা যায়! তারপর বাধ্য হয়েই ফিরতে হয় আশ্রমের দিকে। দুহিতার বিচ্ছেদ-বেদনা সত্ত্বেও ঋষি কণ্বের মনে বেজে ওঠে শান্তির সুর—কারণ 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব'—অতএব কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করে যেন গচ্ছিত বস্তু যথার্থ অধিকারীকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতই মুক্তির নিশ্চিন্ততা তাঁকে শান্তি দেয়।

রাজকার্য সম্পাদনের পর দুষ্যন্ত বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে আসছেন—সঙ্গে বিদূষক। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে রানী হংসপদিকার গান—'হে নবমধুলোভী মধুকর, নতুন আম্রমঞ্জরীর আস্বাদ গ্রহণ করে পূর্বের আদৃত পদ্মের প্রতি ভালবাসা বিস্মৃত হলে?' রাজা বুঝতে পারেন—রানী বসুমতীর প্রতি বর্তমান আকর্ষণ লক্ষ্য করে পূর্বের প্রিয়তমা হংসপদিকা তাঁর মধুকরবৃত্তিকে ইঙ্গিত করছেন; তাই বিদূষককে দিয়ে বলে পাঠালেন—'খুবই নিপুণভাবে আমাকে তিরস্কৃত করা হয়েছে।' এই সঙ্গীতের বিষাদময়তায় রাজা অভিভূত হয়ে পড়েন—কি কথা যেন তাঁর মনে পড়েও পড়েনা—সুন্দর কোনো দৃশ্য বা মধুর সঙ্গীত যেন কোন জন্মান্তরের সুখস্মৃতি বহন করে আনে! রাজার আর বিশ্রাম করা হ'লো না কারণ, কঞ্চুকী সংবাদ নিয়ে আসে—'দ্বারে উপস্থিত কণ্বশিষ্য।' যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের আনয়নের আদেশ দেন দুষ্যন্ত। ঋষিকুমাররা প্রবেশ করলে সসম্ভ্রমে তিনি উঠে দাঁড়ান—জিজ্ঞাসা করেন আশ্রমের কুশলবার্তা—কিন্তু অন্তরে তাঁর বিস্ময়—বৃদ্ধা তাপসী ব্যতীত আরেকজন অবগুণ্ঠনবতী

কে ঐ নারী এই তাপসদলে, যার আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে সুন্দরী এবং যুবতী !. আনুষ্ঠানিক কুশল-সমাচারের পর ঋষিকুমারেরা প্রকৃত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন—'যোগ্যপাত্র দুষ্যন্ত ও মূর্তিমতী সৎক্রিয়া শকুন্তলা—এই তুল্যগুণসম্পন্ন বধূবরের মিলনকে ঋষি কণ্ব সমর্থন করেছেন, যদিও অভিভাবকের অনুমতির অপেক্ষা না রেখে শুধুমাত্র পরস্পরের শপথ-বিনিময়েই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এবার অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে অন্তঃপুরে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।' শকুন্তলার হৃদয় উৎকণ্ঠায় দুরুদুরু—না জানি এবার আর্যপুত্র কি উত্তর দেন। অভিশাপের প্রভাবে লুপ্তস্মৃতি রাজা বিস্মিতভাবে বলেন—'এ আবার কী ব্যাপার !' শকুন্তলা স্তম্ভিত, বিনামেঘে বজ্রাঘাত ! শার্ঙ্গরব ভাবেন, বুঝি ভালবাসার অভাবই এই বিরূপতার কারণ—তাই তিনি বলেন—'পত্নী প্রিয় বা অপ্রিয় হোক, স্বামিগৃহই তার যথার্থ স্থান, বিবাহিতা কন্যার দীর্ঘ পিতৃগৃহবাস নিন্দনীয়।' দুষ্যন্ত আরও বিমূঢ়ভাবে বলেন—'আমি কী একে বিবাহ করেছি ?' বিবাহের ব্যাপারটির সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি শকুন্তলাকে হতাশার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করে। শার্ঙ্গরব আর বেশীক্ষণ শান্ত থাকতে পারেন না—তিনি বলে ফেলেন—'ধনগর্বীদের পক্ষে এই রকম ব্যবহার কিছুই বিচিত্র নয়।' ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত গতি লাভ করছে দেখে গৌতমী ভাবেন, শকুন্তলার মুখ দেখলে হয়তো বা রাজার পূর্বপরিচয় মনে পড়বে—তিনি এগিয়ে এসে শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করে দিলেন—সেই অনিন্দ্য কান্তি রাজাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু বিবাহের কথা কিছুতেই তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হলো না ! এক্ষেত্রে কী করে তিনি গর্ভবতী পরস্ত্রীর সংস্পর্শে নিজেকে কলুষিত করবেন ? বাধ্য হয়েই একথা তপস্বীদের জানালেন—ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়েন শকুন্তলা—শার্ঙ্গরব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। শারদ্বত তাঁকে থামিয়ে শকুন্তলাকে বলেন—'রাজার বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এমন কোনো প্রমাণ তুমি দাও।'

শকুন্তলার মনে পড়ে যায় অভিজ্ঞান—অঙ্গুরীয়কের কথা—সখীরা

তো বলেও দিয়েছিল—রাজা যদি চিনতে না পারেন তাহলে ওটি দেখাতে হবে। তাড়াতাড়ি আংটি খুলতে গিয়ে দেখেন—কোথায় আংটি। শূন্য আঙুল! আর তো কোনো উপায় নেই। রিক্ত দৃষ্টিতে গৌতমীর দিকে চেয়ে থাকেন। গৌতমী বুঝতে পারেন—পথে শচী-তীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় নিশ্চয় হাত থেকে খুলে জলে পড়ে গেছে আংটি। তাঁর একথা শুনে রাজা স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বকে উপহাস করেন। নিরুপায় শকুন্তলা তার নারীত্বের অবমাননা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তপোবনে অন্তরঙ্গতায় মধুর দু'একটি নিভৃত স্মৃতির চিত্র ধীরে ধীরে লোকসমক্ষে উন্মোচিত করে চলেন—একদিন বেতসকুঞ্জে পদ্মপাতায় জল নিয়ে মৃগশিশুকে আপনি পান করাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অপরিচিত বলে সে আপনার কাছে গেল না, পরে আমার কাছ থেকে ঐ জল পান করায় পরিহাস করে আপনি বললেন—'তোমরা দু'জনেই আরণ্যক প্রাণী, তাই পরস্পরের প্রতি সহজ বিশ্বাস।'

কিন্তু শকুন্তলার এই সরল বর্ণনা রাজার কাছে কার্যসিদ্ধির জন্যে স্ত্রীসুলভ মিথ্যাভাষণরূপে অবজ্ঞাত হওয়ায় গৌতমীও অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন—'তপোবন-লালিতা শকুন্তলা কপটতা জানে না।' রাজা উপহাস করেন—'স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ইতর প্রাণীর স্ত্রীজাতিতেও অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়—স্ত্রীকোকিল অনায়াসে অন্য পাখীকে দিয়ে নিজের শাবক পালন করিয়ে নেয়!' আর সংযত থাকতে পারেন না শকুন্তলা—তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—'অনার্য, তুমি সকলকেই নিজের মত কপটাচারী মনে কর—তৃণাচ্ছন্ন কূপের মতই ধর্মের ভেকধারী তোমার সংসর্গ বিপজ্জনক!' পরমুহূর্তেই তিনি ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়েন—'পুরু-বংশের প্রতি বিশ্বাসে এই মুখে মধু অন্তরে বিষযুক্ত ব্যক্তির উপর আস্থা অর্পণ করে স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন হ'লাম!' শার্ঙ্গরব ও রাজার মধ্যে উত্তেজিত বাক্-বিনিময় চলতে থাকে দেখে শারদ্বত মীমাংসার জন্যে এগিয়ে আসেন—'গুরুর আদেশ

অনুসারে পত্নীকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম—এখন গ্রহণ করা বা ত্যাগ করা সবই আপনার ইচ্ছাধীন!' তাঁরা চলে যেতে উদ্যত হতেই—'এই প্রতারক আমাকে বঞ্চনা করল, আর তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছ?'—একথা ব'লে নিঃসহায় শকুন্তলা এঁদের অনুসরণ করতে গেলেন—কিন্তু গতি রুদ্ধ হ'লো শার্ঙ্গরবের তীব্র ভর্ৎসনায়। শারদ্বতও শকুন্তলাকে বলেন—'রাজা যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে কলঙ্কিনী কন্যাকে নিয়ে কণ্ব কিই বা করবেন, আর প্রকৃতই যদি শকুন্তলা সাধ্বী হন তাহলে পতিগৃহে দাসীবৃত্তিও কাম্য হওয়া উচিত।' দুষ্যন্তেরই বা এক্ষেত্রে কী করণীয়—একদিকে পরস্ত্রী গ্রহণের পাপ, অপরদিকে যদি সত্যিই বিভ্রম হয় তাহলে ধর্মপত্নী ত্যাগের অপরাধ! সমস্যার সমাধান দিলেন রাজপুরোহিত। তিনি বললেন—'যে পর্যন্ত না পুত্র জন্মায় সে পর্যন্ত শকুন্তলা আমার গৃহেই বসবাস করুন; গণকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন দুষ্যন্ত রাজচক্রবর্তীর লক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ করবেন। ঋষির দৌহিত্র যদি এই লক্ষণযুক্ত হয় তাহলে রাজা শকুন্তলার পত্নীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে দু'জনকেই সাদরে অন্তঃপুরে গ্রহণ করতে পারবেন।' রাজাও এই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানালেন। তপস্বিদল বিদায় নেওয়ার পর পুরোহিতও ক্রন্দনরতা শকুন্তলাসহ প্রস্থান করলেন—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল, পুরোহিত এসে জানালেন—'ভাগ্যের প্রতি দোষারোপকারিণী, ক্রন্দনপরায়ণা সেই বালাকে এক জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীআকৃতি শূন্যে তুলে নিয়ে অপ্সরাতীর্থের দিকে চলে গেল!' অন্তরে বিচলিত হলেও রাজা উদ্বেগহীনতার ভাণ করে বলেন—'যাক্, যে ব্যাপার আমরা পূর্বেই পরিত্যাগ করেছি সে ব্যাপারে আর চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা সকলে বিশ্রাম করুন।' ক্লান্ত রাজা নিজেও শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

কিছুকাল কেটে গেছে। একদিন এক ধীবরকে ধরে নিয়ে আসে প্রহরীরা, তার অপরাধ, তার কাছে রাজার নাম লেখা আংটি পাওয়া

গেছে। তারা তো তাকে চোর ভেবে শূলে চড়াতে চায়, কিন্তু রাজ-শ্যালক নগরপাল গেলেন রাজার কাছে—তাঁকে আংটিটি দেখিয়ে তাঁর আদেশ আনার জন্যে। ইতিমধ্যে রক্ষীরা ধীবরকে যতদূর সম্ভব লাঞ্ছিত করতে থাকে—আত্মপক্ষসমর্থনে তার কোনো বক্তব্যতেই তারা কান দেয় না। সে যতই বলে—'আমি 'কুন্তীরক', শক্রাবতারবাসী একজন ধীবর, শচীতীর্থের জলে মাছ ধরতে গিয়ে মাছের পেটে এই আংটি পেয়েছি—কিছু অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নগরে বেচ্‌তে যেতেই আপনারা আমায় ধরে ফেললেন'—ততই রক্ষীদের লাঞ্ছনা-বিদ্রূপের কশাঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। নিরপরাধ ধীবরকে শূলে চড়ানোর জন্যে তারা যখন ব্যগ্র—তখন দূরে দেখা গেল শ্যালকমশাই রাজাদেশ নিয়ে আসছেন; উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রক্ষীরা। কিন্তু হায়, কাছে এসে নগরপাল তাদের এত আশায় ছাই দিলেন—রাজা আংটি পেয়ে ধীবরকে শাস্তি তো দিলেনই না, বরং কিছু পুরস্কার পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐটি দেখে তাঁর যেন কোন পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে গেল! রক্ষীরা ধীবরের সৌভাগ্যে ঈর্ষিত। ধীবর কিন্তু উদার হয়ে তার পুরস্কারের কিছু অংশ ভাগ করে দিল এদের মধ্যে—তারপর সকলে রওনা হ'লো পানশালার উদ্দেশ্যে।

অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর দুর্বাসার অভিশাপজনিত মোহ দূর হওয়ায় দুষ্যন্তের এখন শকুন্তলার বিবাহসংক্রান্ত সব কথাই স্মৃতিপটে উদিত হয়েছে। কিন্তু তাঁকে ফিরে পাওয়ার কোনো উপায়ই তো তাঁর জানা নেই। বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি মুহ্যমান—রাজকার্য সম্পাদন তাঁর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠেছে—দেহ ক্ষীণ—খুলে পড়ছে শীর্ণ হাতের বলয়—রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি ও দুঃখের ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে। রাজ্যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ নিষিদ্ধ। অবসর যাপনের জন্যে বিদূষকসহ দুষ্যন্ত প্রমোদ-উদ্যানে আসেন—কিন্তু উদ্যান-প্রকৃতিও যেন তাঁর শোকের অংশভাক্—তাই বসন্তের আগমন সত্ত্বেও কুরুবক কুঁড়ি অবস্থাতেই থেকে গেছে—কোকিলের স্বরও শোনা যাচ্ছে না—

সমগ্র পরিবেশ এক বিষাদময়তায় সমাচ্ছন্ন। শকুন্তলা-জননী মেনকার অনুরোধে অপ্সরা সানুমতী তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে দুষ্যন্তের রাজধানীতে আসেন—রাজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে সখী শকুন্তলার কাছে সংবাদ নিয়ে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। অদৃশ্য হয়ে তিনি শকুন্তলার জন্যে রাজার বিলাপ শুনতে থাকেন। সখীসহ শকুন্তলার জলসেচনরতা অবস্থার যে চিত্র দুষ্যন্ত অঙ্কন করছিলেন সেটি সম্পূর্ণ করার জন্যে সেখানে আনিয়ে নিলেন—ছবিতে শকুন্তলার মুখের দিকে ধাবমান সেই মধুপটিকেও অঙ্কিত করা হয়েছে—দেখতে দেখতে চিত্রার্পিতা শকুন্তলাকে তাঁর প্রাণময়ী বলে ভ্রম হয়—ভ্রমরটিকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হলেন। বিদূষক তাঁকে সচেতন করে দিলে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে খেদোক্তি করেন—'প্রকৃত শকুন্তলা যখন কাছে এসেছিল তখন মোহবশত তাকে অবহেলা করে এখন চিত্রের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছি—এ যেন পথে সুশীতল নদীজলকে উপেক্ষা করে এসে মরীচিকার পিছনে ছোটা।' বলা বাহুল্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার আন্তরিক অনুরাগের প্রকাশ, এবং তাঁর বিচ্ছেদে কাতর বিলাপ—এ সব-কিছুই সানুমতীকে সন্তুষ্ট করে, কারণ এই সংবাদ শকুন্তলার কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি সখীকে সুখী করতে পারবেন।

অমাত্য পিশুন একটি বিচার্য বিষয় পত্রে লিখে রাজার কাছে প্রেরণ করেন—নিঃসন্তান বণিক্ ধনমিত্র সমুদ্রে নৌকাসহ নিমজ্জিত হওয়ায় তার বিষয়-সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করা ছাড়া উপায় কী? কিন্তু রাজা আদেশ দিলেন খোঁজ নেওয়া হোক তার কোনো অন্তঃসত্ত্বা পত্নী আছে কিনা। প্রতিহারী জানায় ধনমিত্রের যে স্ত্রী অযোধ্যার বণিক্-কন্যা সে সন্তানসম্ভবা। রাজার আদেশে সেই গর্ভস্থ সন্তানকেই উত্তরাধিকারিরূপে স্থির করা হয়—তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে 'নিরপরাধ কোনো প্রজার সন্তানবিয়োগ হলে রাজা দুষ্যন্তই তার বন্ধুর স্থান গ্রহণ করবেন'। প্রতিহারীর বিদায়ের

পর নিজের সন্তানহীনতার কথা চিন্তা করে দুষ্যন্ত দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন—পূর্বপুরুষেরা তাঁর অবর্তমানে প্রাপ্য জলগণ্ডুষ থেকে বঞ্চিত হবেন—এই চিন্তা তাঁকে ক্লিষ্ট করে তোলে। একথাও তাঁর মনে পড়ে—ধর্মপত্নী শকুন্তলার গর্ভে তাঁর সন্তান-জন্মের সম্ভাবনা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও সেই ফলদায়িনী বসুন্ধরাস্বরূপা পত্নীকে বিস্মৃতি হেতু ত্যাগ করেছেন—অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন তিনি। রাজার অবস্থা স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করে সানুমতী রওনা হলেন সখীকে জানানোর জন্যে। রাজা ইতিপূর্বে রাজ্ঞী বসুমতীর আগমন সম্ভাবনায় শকুন্তলার চিত্রটি বিদূষকের হাতে দিয়ে তাকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদে প্রেরণ করেছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে শোনা গেল তার কাতর আর্তনাদ! কোন এক দুর্বৃত্ত তাকে শূন্যে তুলে যজ্ঞের বলির মতই হত্যা করতে উদ্যত! অন্তরীক্ষ থেকে ভেসে-আসা বয়স্যের কাতর আহ্বান রাজাকে বিচলিত করে তোলে—জড়তা দূরে ফেলে ধনুর্বাণসহ অদৃশ্য আততায়ীকে দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছেন—এমন সময় সামনে আবির্ভূত হলেন ইন্দ্র-সারথি মাতলি। কালনেমি-পুত্র দুর্জয় নামে দানবকে বিনাশের জন্যে দেবরাজ ইন্দ্র পরাক্রমশালী রাজা দুষ্যন্তকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—দেবরাজের এই আদেশ দুষ্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিদূষক মাধব্যকে কেন এই ভীতি প্রদর্শন? মাতলি বলেন, দুঃখে ম্রিয়মাণ রাজাকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করার জন্যেই এই ছলনা। তৎক্ষণাৎ দস্যুদলনের জন্যে মাতলির সঙ্গে রাজা যাত্রা করলেন।

দৈত্য নিধনের পর ইন্দ্রের সভায় প্রচুর সম্মান লাভ করলেন দুষ্যন্ত। কর্তব্য সম্পাদনের পর তিনি মাতলির রথে আকাশপথ দিয়ে নিজ রাজ্য অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করছেন। ক্রমশ পৃথিবী নিকটস্থ হয়ে আসতে থাকে—পর্বতশৃঙ্গগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায়—সূত্রের মত নদীগুলিতে এখন জলপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়—বন্ধুর ভূমিভাগ ক্রমশ প্রত্যক্ষ হতে থাকে। হেমকূট পর্বত শিখরে রথ থেকে অবতরণ করে

রাজা ইন্দ্রের জনক-জননী মারীচ ও অদিতির চরণবন্দনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মারীচাশ্রমের শান্তিময় পরিবেশ রাজাকে মুগ্ধ করে। বল্মীকাবৃতদেহ তপস্বীরা উগ্র তপস্যায় রত—মন্দারতরুরাজি শোভিত—কল্পবৃক্ষের অরণ্যসমন্বিত স্বর্ণপথে ভূষিত জলাশয়যুক্ত এই আশ্রমভূমি যেন স্বর্গের চেয়েও সুখদায়ক স্থান! মাতলি গেলেন মহর্ষি মারীচকে দুষ্যন্তের আগমন-সংবাদ জানাতে। প্রতীক্ষারত রাজা শুনতে পেলেন এক শিশুর কণ্ঠস্বর—'সিংহ, হাঁ কর্, তোর দাঁত গুন্‌ব' —এই কথা বল্‌তে বল্‌তে সিংহশাবককে জোর করে ধরে নিয়ে এক বালক প্রবেশ করে—সঙ্গের তাপসী দু'জন তপোবনের পশুর প্রতি অত্যাচার থেকে তাকে বিরত করার চেষ্টা করে; কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বালকটির আকৃতি দেখে রাজা বিস্মিত। বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। নিবৃত্ত করার জন্যে তাপসী অন্য এক খেলনার কথা বলতেই বালক বলে ওঠে—'কই, দাও।' একি! রাজা চমকে ওঠেন, শিশুটির প্রসারিত করতলে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন। খেলনা আনার জন্যে এক তাপসী চলে যাওয়ায় অপরার কাছে বালকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে রাজা জানতে পারেন—এ প্রকৃতপক্ষে—ক্ষত্রিয়-সন্তান, নাম সর্বদমন।

—কোন বংশে জাত?

—পুরু বংশে।

—পিতার নাম? ঘৃণার সঙ্গে তাপসী বলে 'কে সেই পত্নীত্যাগী অধার্মিকের নাম মুখে আনবে?' এইসময় মাটির ময়ূর নিয়ে আরেক তাপসী এসে বলে—'পশ্য শকুন্তলাবণ্যম্'—'শকুন্ত' অর্থাৎ পাখিটির শোভা দেখ। কিন্তু বালকটি বলে—'কোথায় আমার মা?' অতএব এ'র মায়ের নাম শকুন্তলা, সেকথাও বোঝা গেল। রাজার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে—বালকের হাত থেকে কখন খুলে পড়ে গেছে রক্ষাকবচ। তাপসীরা ব্যস্ত হয়ে উঠতেই রাজা সেটি সংগ্রহ করে তাদের হাতে দিয়ে বলেন—'সিংহ-

শাবকের সঙ্গে খেলার সময় পড়ে গিয়েছিল।' তাপসীরা হতবাক্—তারা বলে—'এই কবচ ভগবান মারীচ কর্তৃক মন্ত্রপূত—পিতামাতা ব্যতীত আর কেও স্পর্শ করলে সর্প হয়ে তাকে দংশন করে।' তারা এই রকম বহু ঘটনার সাক্ষী। এবার রাজা নিঃসন্দেহ হলেন। একজন তাপসী ইতিমধ্যে শকুন্তলাকে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলে। এক-বেণীধরা তপঃশীর্ণা শকুন্তলা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসেন—দূর থেকেই চিনতে পারেন স্বামীকে। কাতর অনুনয়ে পূর্বের ভ্রমের জন্যে ক্ষমা চেয়ে শকুন্তলার পায়ে পড়েন দুষ্মন্ত—বলা বাহুল্য, পতিব্রতা পত্নীর আর আক্ষেপের কোনো কারণ থাকে না। পুত্রসহ দম্পতী এখন মারীচ ও অদিতিকে প্রণাম জানানোর জন্যে অগ্রসর হ'ন। ঋষিদম্পতী আন্তরিক আশীর্বাদের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করেন। পুত্র ইন্দ্রের সহায়তা করায় তাঁরা দুষ্মন্তের প্রতি সন্তুষ্ট। মেনকা-কন্যা শকুন্তলাসহ এই আশ্রমে থেকেই তাঁদের পরিচর্যা করছিলেন—পুত্রের জাতকর্ম, নামকরণ ইত্যাদি ক্রিয়া মারীচ কর্তৃকই সম্পন্ন হয়েছিল। রাজার মোহের কারণ যে দুর্বাসার অভিশাপ—সেই ঘটনাটি তাঁরা এখন বিবৃত করেন—ফলে শকুন্তলার আর ক্ষোভের কোন কারণ রইল না—বুঝতে পারলেন সেই প্রত্যাখ্যান দুষ্মন্তের সচেতনতায় ঘটেনি। ঋষি কণ্বের কাছে পাঠানো হ'লো এই মিলনবার্তা। সমস্ত প্রাণীদের দমনহেতু 'সর্বদমন' ও সসাগরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অধীশ্বর প্রজাদের ভরণহেতু 'ভরত' নামে ভূষিত পুত্র ও পত্নীসহ ঋষিদম্পতীর আশীষ লাভ করে রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পার্থিব কামনায় যে প্রেমের অঙ্কুর অনুতাপে দগ্ধ ও তপঃশীর্ণ হওয়ায় নিখাদ সেই প্রেম পরিশেষে ধন্য হয়।

মৃচ্ছকটিকম্

পরম রূপবান্ গুণবান্ ব্রাহ্মণ চারুদত্ত পেশায় বণিক্ হলেও ধনহীন। অতিরিক্ত দানশীলতার জন্যেই তাঁর এই দারিদ্র্যবরণ। অবশ্য তাঁর ক্ষোভ নিজের কষ্টের জন্যে নয়, প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণে অক্ষমতাই তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু দারিদ্র্য সত্ত্বেও নগরের প্রধানা নটী বসন্তসেনা তাঁর প্রতি অনুরক্তা। যথার্থ অনুরাগ তো অর্থের বিচার করে না! তাই গুণমুগ্ধা নায়িকা নায়ক চারুদত্তের সঙ্গে মিলনে উৎসুক।

আসন্ন সন্ধ্যায় বসন্তসেনা বেরিয়েছেন অভিসারিকা বেশে—গন্ধ-মাল্য-অলংকারে সুসজ্জিতা সুন্দরী নটী লাবণ্যশোভায় অপরূপা! তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে কামার্ত রাজশ্যালক শকার—সঙ্গে ভৃত্য ও সহচর ব্রাহ্মণ বিট। বিট নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে বসন্তসেনাকে শকারের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করে—কিন্তু গুণে যার মন মুগ্ধ হয়েছে, তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ কি তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে? ঘৃণাভরে বসন্তসেনা শকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন—'গুণো কৃখু অনুরাঅস্ম কারণং, ণ উণ বলাক্কারো'—গুণই অনুরাগের কারণ—বলাৎকার নয়।—বিপদ্ আসন্ন দেখে ত্রস্তা হরিণীর মতই তিনি ছুটে চলেন শকারের কাছ থেকে আত্মগোপনের জন্যে। পাছে অলংকারের শিঞ্জন তাঁর অস্তিত্বকে সোচ্চার করে তোলে—তাই সেগুলিও খুলে ফেলে বেঁধে রাখলেন বস্ত্রে—অন্ধকারে আড়াল দিয়ে এগিয়ে যেতে বাধা পেলেন এক প্রাচীরের গায়ে। দূর থেকে ভেসে-আসা বিট-শকারের কথায় বুঝতে পারেন—এইটিই চারুদত্তের বাড়ি—কিন্তু কোথায় দ্বার, কোথায়ই বা আলো! ওদিকে ধেয়ে আসছে মাংস-লোলুপ হিংস্র জানোয়ার-দল!

চারুদত্ত সবে সন্ধ্যাপূজা সমাপন করেছেন। পূজার সামান্য নৈবেদ্য রাজপথে বিতরণের উদ্দেশ্যে সখা মৈত্রেয় দাসী রদনিকাকে

বললেন প্রদীপ ধরতে, নিজে দরজা খুলতে এগিয়ে গেলেন—এই মুহূর্তেই বসন্তসেনা এসে পড়েছেন সেখানে—আগল খোলামাত্রই তিনি আঁচলের ঝাপ্‌টায় নিভিয়ে দিলেন প্রদীপটি—পাছে তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঘটনার দ্রুততায় রদনিকা বা মৈত্রেয় কারও মনেই কোনো সন্দেহ হ'লো না—বুঝি দম্‌কা হাওয়াতেই প্রদীপ নিভে গেল! ইতিমধ্যে শকার তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত—অন্ধকারে কাছের মানুষকেও চেনা যায় না; কামোন্মত্ত শকার কখনও 'বিট'কে কখনও বা ভৃত্যকেই বসন্তসেনা ভেবে জড়িয়ে ধরছে। অবশেষে রদনিকার চুলের মুঠি ধরে নিশ্চিন্ত হ'লো—'এই তো বসন্তসেনাকে ধরে ফেলেছি, আর পালাবে কোথায়!' উত্ত্যক্ত দাসী রুখে দাঁড়ায়—'মহাশয়রা কি ধরণের ব্যবহার শুরু করেছেন? স্বর শুনে বিট বুঝতে পারেন—এ তো বসন্তসেনা নয়! কিন্তু মূর্খ শকার ভাবে বসন্তসেনা বুঝি গলার স্বর পরিবর্তন করে তাদের ধোঁকা দিতে চাইছেন! এই সময়ই মৈত্রেয় আবার প্রদীপটি জ্বেলে নিয়ে ফিরে এলেন—রদনিকার লাঞ্ছনা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—কিন্তু বিট ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অনিচ্ছাকৃত অপমানের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বললেন—'এক গণিকাকে অনুসরণ করতে এসেই এই দুর্বিপাক। একথা যেন মাননীয় চারুদত্তের কানে না ওঠে, কারণ তাঁর পরিজনদের অসম্মান করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না।' কিন্তু বিটের ক্ষমা চাওয়া ও চারুদত্তের প্রশংসা শকারের সহ্য হলো না। ঈর্ষাকুটিলকণ্ঠে সে ঘোষণা করে—'চারুদত্তকে একথা জানিয়ে দিও—নটী বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি আকৃষ্টা হয়ে তার ঘরে ঢুকেছে। এখন চারুদত্ত যদি রাজশ্যালকের হাতে বসন্তসেনাকে ফিরিয়ে দেয় তাহলেই বন্ধুত্ব হবে, না হলে আমৃত্যু শত্রুতা থাকবে।'—ইতিমধ্যে শকারের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট বিট চলে গেছেন—অগত্যা কাপুরুষ শকার তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দেয়।

প্রাচীরের ভিতর নারী-আকৃতি দেখে অন্ধকারে চারুদত্ত ভাবেন

দাসী রদনিকা—নিজের চাদরটি দিয়ে বলেন—'পুত্র রোহসেনকে এটি দিয়ে জড়িয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাও।'—কিন্তু বসন্তসেনা সেই সুবাসিত উত্তরীয় হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন—অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার তো তাঁর নেই! রদনিকাসহ মৈত্রেয় ভিতরে আসতেই চারুদত্ত বিস্মিত—এই নারী তবে কে? এতো দাসী রদনিকা নয়! এখন নিজের পরিচয় প্রকাশ করা ছাড়া বসন্তসেনার গত্যন্তর থাকে না। লজ্জিত চারুদত্ত তাঁকে দাসীর মত আদেশ করায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিদূষক মৈত্রেয় যথারীতি শকারের বক্তব্য পেশ করলেন—কিন্তু লম্পটের ক্রোধ চারুদত্তকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারে না। বসন্তসেনার রূপ ও গুণ ইতিপূর্বেই চারুদত্তের হৃদয় জয় করেছে। বিনীতভাবে বসন্তসেনা বলেন—'আমার এই অলংকারগুলি আপনার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই—কারণ এগুলির জন্যই যত দুর্বৃত্তের দল অনুসরণ করে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসন্তসেনার আগ্রহে চারুদত্তকে রাজী হতে হয়। বন্ধু মৈত্রেয়কে এই অলংকার রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বসন্তসেনাকে তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে দিতে চললেন—কারণ অন্ধকার রাজপথ সুন্দরী যুবতীর পক্ষে বিপদ্‌জনক। দু'জনে এগিয়ে চললেন—বাঞ্ছিত-সান্নিধ্য দু'জনের মনে আলোড়ন জাগায়—কিন্তু অল্পক্ষণেই পথ গেল ফুরিয়ে—বসন্তসেনা প্রবেশ করলেন নিজ আবাসে—শূন্যমনে ফিরে এলেন চারুদত্ত।

একদিন সংবাহক নামে চারুদত্তের এক পুরাতন ভৃত্য পাশা খেলায় হেরে গিয়ে প্রাপ্য অর্থ না দিয়েই পালিয়ে আসছিল আসর থেকে—সভাধ্যক্ষ মাথুর ও প্রতিদ্বন্দ্বী দ্যূতকর তার পিছু ধাওয়া করে যায়—পলায়মান সংবাহক এক প্রতিমাশূন্য মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত—তার মাথায় চট্ করে একবুদ্ধি খেলে গেল—অনুসরণকারীদের বিপথে চালিত করার জন্যে সে পিছু হেঁটে মন্দিরে ঢুকে আব্‌ছা অন্ধকারে বিগ্রহের মত বসে রইল। মাথুর ও দ্যূতকর সেখানে এসে বিপরীত দিকের পদচিহ্ন দেখে ভাবল মন্দির থেকে সংবাহক চলে গেছে—কাজেই ওইখানেই বসে তারা পাশাখেলা শুরু করে দিল—জুয়াড়ী

সংবাহক পাশার শব্দে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না—জুয়ার এমনই অমোঘ আকর্ষণ। সে বেরিয়ে এসে যেই পাশায় দান দিতে যাবে অম্‌নি খপ্‌ করে চেপে ধরেছে এরা দু'জন—'আর যাবে কোথায় বাছা-ধন—বার কর জলদি দশ মোহর'। অনেক অনুনয় করে কপর্দকহীন সংবাহক—কিন্তু নিষ্ঠুর জুয়াড়ীদের কাছে কিছুতেই রেহাই নেই। যথেষ্ট উত্তম-মধ্যম দেওয়া সত্ত্বেও যখন কোনমতেই কিছু পাওয়া গেল না তখন তাকে বিক্রী করেই টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত হলো—এই সময় দর্দুরক নামে এক নাগরিক অকুস্থলে এসে হাজির—পাশাখেলায় অভিজ্ঞ এই ব্যক্তি মাথুরের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিফ্‌হাল। সংবাহকের অবস্থা তাঁর মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে—সে এদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল—সুযোগ বুঝে মাথুরের চোখে ধুলো ছিটিয়ে সংবাহককে ইঙ্গিত করতেই সে ছুটে পালিয়ে গিয়ে বসন্তসেনার গৃহে আশ্রয় নিল। বসন্তসেনা প্রশ্ন করে জানতে পারেন —এ ব্যক্তি পূর্বে চারুদত্তের ভৃত্য ছিল—এখন প্রভু ধনহীন হওয়ায় বাধ্য হয়ে জুয়াড়ীর বৃত্তি গ্রহণ করেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মাথুরের জন্য অলংকার পাঠিয়ে সংবাহককে ঋণমুক্ত করলেন—কৃতজ্ঞ সংবাহক জুয়াখেলা ছেড়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের অঙ্গীকার করে বিদায় নেয়।

ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটে গেছে—বসন্তসেনার পোষা হাতী ক্ষেপে গিয়ে রাজপথে এক কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল—কোনো লোকই তাকে বাঁধার জন্যে এগোতে ভরসা পাচ্ছিল না। শেষকালে তাঁর ভৃত্য কর্ণপূরক বহুকষ্টে তাকে শৃঙ্খলিত করতে সমর্থ হ'লো—ধন্য ধন্য পড়ে গেল নগরবাসীদের মধ্যে; পথচারী চারুদত্ত খুশি হয়ে শেষসম্বল গায়ের চাদরখানি দান করে বসলেন কর্ণপূরককে। ফুলের রঙে রাঙানো সুগন্ধি এই উত্তরীয়টি বসন্তসেনা আগেও একবার স্পর্শ করতে সুযোগ পেয়েছিলেন চারুদত্ত তাঁকে দাসী বলে ভুল করায়; এখন হাতে পেয়ে এটি আর ছাড়লেন না—বিনিময়ে ভৃত্যকে মূল্যবান অলংকারই দিয়ে দিলেন।

চৌর্যবিদ্যাবিশারদ শর্বিলক বসন্তসেনার দাসী মদনিকার প্রেম-প্রার্থী—কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে গেলে গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে আনতে হবে। কি করে সংগ্রহ করা যাবে এই মুক্তিপণ? তস্করতা ছাড়া আর কোন পথ তো আপাতত খোলা নেই! অতএব নিজের আয়ত্ত বিদ্যাকেই কাজে লাগাতে মনস্থ করে শর্বিলক। মধ্যরাত্রির গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে রাজপথ ধরে এগিয়ে চলে। সঙ্গীত-রসিক চারুদত্ত গিয়েছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ রেভিলের গান শুনতে—অনেক রাত্রে ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গী মৈত্রেয়ও বাইরের ঘরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন—শর্বিলক সিঁদ কেটে সেই ঘরে প্রবেশ করে—কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে—নির্ধন চারুদত্তের ঘরে দামী জিনিষ আর কিই বা পাওয়া যাবে! হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ঘুমন্ত লোকটির দিকে—বিড়বিড় করে ঘুমের ঘোরে কি বকে যাচ্ছে—যেন কোন অলঙ্কারের কথা বলছে? ওর কাছে রাখা ছেঁড়া পুঁটুলিতে কিই বা বাঁধা আছে? একি, প্রদীপের মৃদু আলোতেও যে সোনার দীপ্তি ঠিক্‌রে উঠ্‌ছে? তাইতো, এ যে মূল্যবান অলঙ্কার! তৎক্ষণাৎ ঐগুলি নিয়ে সে চম্পট দেয়। স্পর্শ পেয়ে ঘুমের ঘোরে মৈত্রেয় ভাবে বুঝি চারুদত্ত এসেছেন—অতএব তাঁর হাতে অলঙ্কারের দায়িত্ব অর্পণ করে নির্বিবাদে নিদ্রা দিতে থাকে। ভোর হয়ে আসে—দাসী মদনিকার ডাকাডাকিতে চোখ রগ্‌ড়ে উঠে বসে বিদূষক মৈত্রেয়—সামনে একি? এমন বিচিত্র সিঁদ কেটে এ ঘরে ঢুকে চোরের লাভ হল কি? অলঙ্কারের পুঁটুলি তো স্বয়ং চারুদত্তের কাছে কাল রাত্রেই গচ্ছিত করে দেওয়া আছে! চারুদত্তও ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সেখানে এসে এই কীর্তি দেখে হতবাক্। বিদূষকের কথা শুনে তিনি সবই বুঝতে পারেন—ঘুমের ঘোরে তস্করকে অলঙ্কার সমর্পণ করে বিদূষক ভাবছে বুঝি চারুদত্তের হাতেই দিয়ে দিয়েছে। অলঙ্কারগুলি অপহৃত হওয়ায় মর্মাহত হয়ে পড়েন তিনি—লোকে নিশ্চয় মনে করবে দারিদ্র্যের

জন্যে নিজেই পরস্বাপহরণ করে চোরের দোহাই পাড়ছেন। স্বামীকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে আসেন সাধ্বী পত্নী ধূতা —তাঁর একটি মাত্র অবশিষ্ট রত্নমালা, যেটি তিনি পিতৃগৃহের স্মৃতিরূপে এতদিন রক্ষা করে আসছিলেন, সেইটিই অর্পণ করেন স্বামীকে ঋণ মুক্ত করার জন্যে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পত্নীর দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন চারুদত্ত। তৎক্ষণাৎ তিনি বিদূষককে পাঠিয়ে দিলেন বসন্তসেনার কাছে এই কথা বলে—'গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি আমি পাশাখেলায় হেরেছি, বিনিময়ে আপনি এই রত্নহার গ্রহণ করুন।'

শর্বিলক বসন্তসেনার বাড়িতে এসে গোপনে মদনিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—মুক্তিমূল্য হিসাবে পাঠায় সেই চুরি-করা অলঙ্কার-গুলি। অলিন্দ থেকে তাদের কথাবার্তার কিছু অংশ বসন্তসেনার কানে গেল—শঙ্কিত হয়ে ওঠেন তিনি—অলঙ্কার চুরি করতে গিয়ে চারুদত্তের কোনো শারীরিক ক্ষতি করেনি তো এই ব্যক্তি? না, আশঙ্কা অমূলক, বাঞ্ছিতার জন্য এগুলি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো অন্যায় করেনি শর্বিলক। অতএব গহনার পুঁটুলিটি গ্রহণ করেন বসন্তসেনা। প্রার্থনা অনুসারে মদনিকাকেও দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে শর্বিলকের হস্তে সমর্পণ করেন বধূরূপে; তাদের যাত্রার জন্য গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিলেন সহৃদয়া বসন্তসেনা। কৃতজ্ঞ দম্পতী বিদায় নিল—শুরু হলো তাদের নতুন জীবনের প্রথম যাত্রা। কিন্তু পথের মাঝেই এক বিপত্তি—সংবাদ এলো শর্বিলকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর্যককে রাজা কারারুদ্ধ করেছেন, কারণ গণকরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে গোপযুবক আর্যকই বর্তমান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজত্ব লাভ করবেন। বন্ধুর বিপদে উদাসীন থাকতে পারেন না শর্বিলক, অতএব নববধূ মদনিকাকে বন্ধু রেভিলের বাড়ীর দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে আর্যকের সহায়তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন।

ওদিকে মৈত্রেয় সেই রত্নহার নিয়ে এসেছেন বসন্তসেনার কাছে গচ্ছিত স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্তে। দাসী সসম্ভ্রমে তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে

আসে—বিলাস-বৈভবের প্রাচুর্য তাঁকে বিস্মিত, বিহ্বল করে তোলে। বহু প্রকোষ্ঠ পার হয়ে তিনি বসন্তসেনার কাছে এসে পৌঁছালেন। চারুদত্তের বক্তব্য যথারীতি জানিয়ে রত্নমালাটি সমর্পণ করলেন মৈত্রেয়—বসন্তসেনাও শ্রদ্ধাভরে সেটি গ্রহণ করে জানালেন—আজই চারুদত্তের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে! রত্নহারটি নিয়ে নেওয়ায় অবশ্য মৈত্রেয় বসন্তসেনার ওপর খুবই বিরক্ত।

চারুদত্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছেন উদ্যানে —আকাশে মেঘের ঘনঘটা—মৈত্রেয় ফিরে এসে জানালেন বসন্তসেনার আগমনের কথা। বিরক্তভাবে তিনি চারুদত্তকে বেশ্যাসংসর্গ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন—কিন্তু হৃদয় দিয়েই হৃদয়ের অনুভব সম্ভব—তাই বসন্তসেনার অন্তরের প্রকৃত পরিচয় মৈত্রেয় না বুঝলেও চারুদত্তের কাছে অজানা ছিল না। অতএব সাগ্রহে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন প্রিয়া-মিলনের আশায়।

দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও অভিসার-সাজে সেজে বসন্তসেনা রওনা হয়েছেন দয়িতের উদ্দেশ্যে। অন্ধকার—ঝড়ঝঞ্ঝা কিছুই তাঁর পথের বাধা হতে পারে না—দারুণ ধারাবর্ষণকে উপেক্ষা করে, বজ্রের গর্জন —বিদ্যুতের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে চারুদত্তের কাছে এসে উপস্থিত। দাসী পরিহাস করে বলে—'রত্নমালাটির মূল্য জানতেই এঁর আগমন, কারণ সেই মালাটি বসন্তসেনা পাশাখেলায় বাজী রেখে খুইয়েছেন—কাজেই তার বদলে এই সোনার গয়নার পুঁটুলিটি রাখুন।' আশ্চর্য! এতো সেই পুঁটুলি যেটি বসন্তসেনা পূর্বে চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন—পরে চোর সিঁদ কেটে নিয়ে যায়। কি করে তা' আবার ফিরে গেল এঁর কাছে—চারুদত্ত ও মৈত্রেয় দু'জনেই হতবাক্। দাসী শর্বিলকসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন বসন্তসেনা—সিক্তবসনা যৌবনবতী নারীর অপরূপ সৌন্দর্য মুগ্ধ করে চারুদত্তকে। বজ্রের গর্জনে ত্রস্তা নায়িকা আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নায়ককে—সাদরে তাঁকে

গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে আসেন চারুদত্ত—প্রিয়-সমাগমে সার্থক হ'লো তাঁর অভিসার।

মিলন-রজনীর হলো অবসান—উদয়াচলে দিবাকরের আবির্ভাব, বিহঙ্গের কলগানে মুখরিত ধরা। দাসীর ডাকে ঘুম ভেঙে যায় বসন্তসেনার—কিন্তু কোথায় প্রিয়তম, পাশে নেই কেন? বুঝি কোনো ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর বুক! দাসী জানায় খুব ভোরে ওঠেই তিনি নগরের বাইরের পুরাতন উদ্যান-বাটিকায় চলে গেছেন—বসন্তসেনা জাগরিত হলে সেখানে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়ে গাড়ির ব্যবস্থাও করে গেছেন। চলে যাওয়ার আগে চারুদত্তের পত্নী ধূতাকে সেই রত্নমালাটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন বসন্তসেনা—কিন্তু আভিজাত্যবোধসম্পন্না ধূতা বলে পাঠালেন—'স্বামী যখন প্রীতিভরে আপনাকে এই অলঙ্কার দিয়েছেন তখন তা' আপনারই প্রাপ্য। আমার চিরস্থায়ী অলঙ্কার আর্যপুত্র স্বয়ং।' চারুদত্তের পুত্র রোরুদ্যমান রোহসেনকে কোলে নিয়ে নানাভাবে ভুলানোর চেষ্টা করে দাসী রজনিকা—তার দাবী—মাটির গাড়ি নিয়ে সে খেলবে না, সোনার গাড়ি চাই। শিশুর চোখে জল দেখে বসন্তসেনা স্থির থাকতে পারেন না—তাঁর সেই স্বর্ণালঙ্কারগুলি দিয়ে বলেন—'এগুলি দিয়ে সোনার গাড়ি গড়িয়ে খেলা কোরো।' তাঁর আর দেরী করা চলে না, কারণ ভৃত্য এসে জানায় 'গাড়ি তৈরী'। অতএব সামান্য প্রসাধন সেরে নেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন—এই সুযোগে ভৃত্য চলে গেল গাড়ির ঢাক্‌নাখানি নিয়ে আস্‌তে। ঠিক এই সময়ই রাজশ্যালক শকারের গাড়ি নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল ভৃত্য সংস্থানক সেই পুরাতন উদ্যানে যেখানে শকার উপস্থিত—এই উদ্যানেরই এক অংশে চারুদত্তও বসন্তসেনার জন্যে প্রতীক্ষারত। পেছনের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা দিতে গিয়ে চারুদত্তের বাড়ির দরজাতেই গাড়ি রেখে সংস্থানক সবে নেমে গেছে—বসন্তসেনাও ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে এসে ওইটিই

তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট গাড়ি ভেবে চড়ে বসেছেন—সংস্থানকও কয়েক মুহূর্ত পর ফিরে এসে গাড়িটি চালিয়ে দিল।

রাজপথে ঘোষণা শোনা যাচ্ছে—'রাজার কারাগার থেকে গোয়ালার ছেলে আর্যক পালিয়েছে।' গণকরা জানিয়েছিলেন—বর্তমান রাজা পালকের পর আর্যকই রাজা হবে। অতএব রাজা পালক বন্দী করে রেখেছিলেন আর্যককে। বন্ধু শর্বিলক এই খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সাহায্যের জন্যে। তাঁর সহায়তাতেই কারারক্ষীকে কাবু করে আর্যক নিজেকে মুক্ত করেছে। পালাতে গিয়ে সেও এসে পড়েছে চারুদত্তের বাড়ির সামনে—তখন চারুদত্তের ভৃত্য সবেমাত্র আচ্ছাদনটি নিয়ে এসে গাড়িসহ অপেক্ষা করছে বসন্তসেনার জন্যে। কিন্তু তিনি তো ভুলক্রমে ইতিমধ্যেই সংস্থানক-চালিত শকারের গাড়ীতে উঠে চলে গেছেন। আর্যক এসে পড়ে গাড়ীটির পেছন দিকে—তার পায়ে বাজ্‌ছে ছিন্ন শৃঙ্খল—ভৃত্য ভাবে বুঝি বসন্তসেনা এসেছেন, তাঁরই নূপুরের শব্দ। অবাধ্য গরুগুলিকে নিয়ে সামনের দিকে ব্যস্ত থাকায় সে না দেখেই বলে—'আর্যা, আপনি পেছন থেকেই গাড়ীতে উঠুন, সামনে গরুগুলি খুব পাগলামি জুড়েছে।' আর্যক দেখে আত্মগোপনের এইটিই সুবর্ণ-সুযোগ। অতএব সে গাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। গাড়ি চলতে সুরু করে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই গাড়ি থামাতে হয়—আর বুঝি শেষরক্ষা হলো না। চন্দনক ও বীরক—দুই সেনাপতি গাড়ির গতিরোধ করে—পরীক্ষা না করে কোনো কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না। চারুদত্তের গাড়ি ও আরোহিণী বসন্তসেনা—চালকের কাছে একথা শুনে চন্দনক অবশ্য গাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু বীরক নাছোড়-বান্দা। অগত্যা বাধ্য হয়েই চন্দনক পরীক্ষার জন্যে এগিয়ে এসে ঢাক্‌না তুলেই হতবাক্—এই তো পলায়িত গোপনন্দন। নিরুপায় আর্যক তার শরণাপন্ন হয়। চন্দনক দেখে উভয়সঙ্কট—প্রথমত চারুদত্তের গাড়ীতে বন্দীর পলায়নের ব্যাপারটি রাজদ্বারে চারুদত্তের

অপরাধ প্রমাণ করবে, কিন্তু চারুদত্তের গুণগ্রাহী চন্দনক এইরকম কিছু ঘট্‌তে দিতে রাজী নয়, তাছাড়া আর্যকের সাহায্যকারী শর্বিলকের কাছেও নানাভাবে ঋণী হওয়ায় তার ক্ষতিসাধন করাও চন্দনকের কাম্য নয়, অন্যদিকে রাজকার্যের দায়িত্ব! যাইহোক শরণাগতকে আপাততঃ অভয় দেওয়াই কর্তব্য কারণ—'ভীতাভয়-প্রদানং দদতঃ পরোপকাররসিকস্য। যদি ভবতি ভবতু নাশস্তথাপি চ লোকে গুণ এব। "—ভীত ব্যক্তিকে অভয়দানকারী এবং পরোপকারীর মৃত্যু হলেও তার গুণ পৃথিবীতে স্বীকৃত হবে।' অতএব চন্দনক গাড়িটি ছেড়ে দিলেও বাদ সাধল বীরক। চন্দনকের বক্তব্যের অসংলগ্নতা, আর্যক বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে 'আর্যা বসন্তসেনা' বলা—ইত্যাদি ব্যাপারগুলি স্বাভাবিকভাবেই বীরককে সন্দিগ্ধ করে তোলে—অতএব সে নিজেই গাড়ি পরীক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে। চন্দনক দেখে সমূহ বিপদ—যে ভাবে হোক একে নিবৃত্ত করতেই হবে—কাজেই এর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া যাক্। পারস্পরিক অপমানসূচক উক্তিতে অবস্থা যখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে তখন পদাঘাতে বীরককে মাটিতে ফেলে দিয়ে চন্দনক নিজের তরবারিটি গাড়ির মধ্যে দিয়ে বলল—'আর্যে বসন্তসেনে, পরীক্ষার চিহ্নস্বরূপ এই তরবারিটি দিলাম'—এই বলে গাড়িটিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। এইভাবে অস্ত্রহীন আর্যক অস্ত্র লাভ করল। ক্রুদ্ধ বীরক রাজদরবারে নালিশ জানাতে গেল; চন্দনকও ভাবে 'তার শাস্তি আসন্ন, অতএর সপরিবারে আর্যকেরই অনুসরণ করা যাক্।'

নগরোপান্তে উদ্যানে মৈত্রেয়সহ চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতীক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে-–এমন সময় শোনা গেল ভৃত্য বর্ধমানের গলার স্বর—আশান্বিত হয়ে উঠলেন চারুদত্ত—মৈত্রেয়কে বললেন সসম্মানে যেন বসন্তসেনাকে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু গাড়ির ভিতর এ কে? বিদূষক পরিহাস করে বলে—এতো বসন্তসেনা নয়, এ যে বসন্তসেন! কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এসে চারুদত্ত ত বিস্মিত—

কে এই সুপুরুষ শক্তিমান কুমার ? আর্যক নিজের পরিচয় জানিয়ে তাঁর শরণ নেয়। শরণাগতকে অভয় দিয়ে তিনি তার পায়ের শিকল খুলে দিলেন, এমনকি নিজের গাড়িটিও দিয়ে দিলেন আর্যকের পলায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে। এইভাবে ভবিষ্যৎ রাজা আর্যক ও চারুদত্ত বাঁধা পড়লেন অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বন্ধনে।

পুষ্পকরণ্ডক নামে এই উদ্যানেরই আরেক দিকে নিজের গাড়ীর অপেক্ষায় বসে আছে শকার ও তার সহচর বিট। জুয়াড়ী সংবাহক ইতিমধ্যে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেছে—সে এই উদ্যানের পুষ্করিণীতে কৌপীন ধুতে এসে পড়ে গেল শকারের সাম্‌নে—বদ্‌রাগী শকার তাকে মারতে যায়, কিন্তু বিট কোনোমতে এই অকাজ থেকে শকারকে নিরস্ত করে। ভৃত্য স্থাবরকের বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছে গাড়ী নিয়ে আসতে—কারণ পথের মধ্যে ঐ গাড়িটিও সেনাপতিরা আট্‌কে দিয়েছিল। বেলা বেড়ে চলে—শকার অধৈর্য হয়ে উঠ্‌ছে—রৌদ্রের খরতাপ ক্রমশ অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে—অবশেষে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল—কাছাকাছি আস্‌তেই শকার গাড়ীতে ঢুক্‌তে যায়—কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়ে পিছিয়ে আসে—ভিতরে এক স্ত্রীমূর্তি কেন ? কোনো রাক্ষসী ঢুকে পড়েছে নাকি ? বিট যথার্থ ব্যাপারটি জানার জন্যে এগিয়ে এসে গাড়ির আচ্ছাদনটি তুলেই বিস্মিত—'এ যে বসন্তসেনা ! তবে হরিণী কি নিজেই বাঘের মুখে এগিয়ে এলো !' সভয়ে বিটের শরণ নিয়ে বসন্তসেনা জানালেন—গাড়ী-সংক্রান্ত ভুলের ফলেই এই বিপত্তি। বিট তাঁকে অভয় দিয়ে শকারকে গাড়ি চড়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে বল্‌তে বাধ্য হন—হ্যাঁ ওখানে রাক্ষসীই বসে আছে, অতএব গাড়িতে ওঠা উচিত হবে না ; আমরা হেঁটেই বাড়ির পথে রওনা হই।' কিন্তু দুর্মতি শকার অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়—গাড়িতে সে চড়ে বসবেই ! পাছে মিথ্যা কথা প্রমাণিত হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বিট বাধ্য হয়ে সত্য প্রকাশ করে ফেলে—'প্রকৃতপক্ষে বসন্তসেনাই এসেছেন অভিসারে।' লম্পট

শকারের উল্লাস দেখে কে! অনেক হাস্যকর অসংলগ্ন উক্তিতে সে বসন্তসেনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে—কিন্তু চারুদত্তে সমর্পিত হৃদয়া বসন্তসেনা ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন—ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে তার মনে—নানা কুকথায় অপমান করার চেষ্টা করে তাঁকে। নিরুপায় বসন্তসেনা গাড়ী থেকে নেমে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন অসহায়ভাবে। ক্ষিপ্ত শকার বিটকে আদেশ করে বসন্তসেনাকে হত্যা করতে—এই নির্মম প্রস্তাবে নিজের কান চেপে ধরে বিট—'এমন কথা শোনাও পাপ'। তখন ভৃত্যকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায় দুর্বৃত্ত—কিন্তু এই কুকাজে ভৃত্য স্থাবরকও রাজি হ'লো না। অগত্যা মিথ্যা কারণ দেখিয়ে তাদের দূরে পাঠিয়ে দিয়ে নৃশংস শকার আবার একান্তে প্রলোভনের জাল বিস্তার করার চেষ্টা করে—কিন্তু বসন্তসেনার একনিষ্ঠতার কাছে দুর্বৃত্তের সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়—চরিত্রহীন খলস্বভাব শকারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন—'যত্নেন সেবিতব্যঃ পুরুষঃ কুলশীলবান্ দরিদ্রোঽপি'—সম্ভ্রান্ত চরিত্র ও উচ্চবংশবিশিষ্ট পুরুষ দরিদ্র হলেও সেবার যোগ্য।' ব্যর্থ লালসায় উন্মত্ত শকার চারুদত্তের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতে করতে গলা টিপে ধরে বসন্তসেনার —নিঃশ্বস রুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত বসন্তসেনার মুখ থেকে একটি কথাই বারবার উচ্চারিত হতে থাকে—'নমো অজ্জ চারুদত্তস্স'—'আর্য চারুদত্তকে নমস্কার।' নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সংজ্ঞাহীন দেহটি মাটিতে পড়ে যায়—আত্মগোপনের জন্যে দ্রুত অন্যদিকে সরে পড়ার চেষ্টা করতে থাকে দুর্বৃত্ত, কিন্তু বিট অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বসন্তসেনার কথা জিজ্ঞাসা করে। শকার প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু পাপ বেশীক্ষণ গোপন থাকে না। শকারের অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকেই ধরা পড়ে যায় তার দুষ্কর্ম। আন্তরিক দুঃখে বিলাপ করতে থাকে বিট—অবশেষে দুর্জনের সঙ্গ পরিহার করে চলে যেতে উদ্যত হতেই শকার তার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করে—মরিয়া হয়ে বিট এবার

অস্ত্রে হাত দেয়—কাপুরুষ শকার তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ায়। বিট স্থির করে—এবার শর্বিলক—আর্যকের সঙ্গে যোগ দেওয়াই ভাল। এই উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করে। এবার ভৃত্য স্থাবরকের পালা। তাকে অলঙ্কারের প্রলোভন দেখিয়ে কুকর্মের সঙ্গী করার চেষ্টা করে শকার—কিন্তু কি সৎ ও নির্লোভ এই সামান্য ভৃত্য!—ঘৃণার সঙ্গে সে উৎকোচের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতএব নিরুপায় শকার একাই শুক্‌নো ডালপালা জড়ো করে ঢাকা দিয়ে দেয় বসন্তসেনার অচেতন দেহ। পাষণ্ড এবার চারুদত্তের বিনাশের জন্যে নতুন ফন্দী আঁটতে থাকে—'বসন্তসেনাকে হত্যার অপরাধ চারুদত্তের ঘাড়ে চাপিয়ে আদালতে নালিশ করা যাক্'। এই উদ্দেশ্যে সে রওনা হয়ে যাওয়ার পরই সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত। তার ভিজা কাপড় সেই শুক্‌নো পাতার স্তূপের ওপর মেলে দিতে গিয়ে দেখে—কার যেন গয়না-পরা হাত দেখা যাচ্ছে ভিতর থেকে! অবাক্ হয়ে যায় সন্ন্যাসী, তাড়াতাড়ি পাতাগুলি সরিয়ে দিতেই দেখা গেল বসন্তসেনার অচেতন-প্রায় দেহ! ইনিই সে দয়াশীলা রমণী যিনি দশমোহর দিয়ে তাকে দ্যূতকর থেকে মুক্ত করেছিলেন। ইঙ্গিতে জল চাইলেন বসন্তসেনা—ভিক্ষু নিজের ভিজা কাপড় নিংড়ে জল দিতে থাকে। জল ও বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ করেন বসন্তসেনা। কাছের ঝুলন্ত লতাটি ধরার জন্যে এগিয়ে দিয়ে ভিক্ষু তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কাছেই বৌদ্ধ মঠে থাকে তার ধর্মভগিনী। আশ্রয়ের জন্যে বসন্তসেনাকে সেখানেই নিয়ে যায় এই পরহিতব্রতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

শকার সোজা এসেছে বিচারালয়ে—প্রথমেই চারুদত্তকে 'খুনী' অপবাদ দিয়ে বসন্তসেনা-হত্যার মামলা রুজু করে দেয়। বিচারক অবশ্য চারুদত্তের মহত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত—কিন্তু রাজার আত্মীয় শকারের রক্তচক্ষুকে অবহেলা করার মত দুঃসাহস তাঁর নেই—অতএব তলব করা হলো চারুদত্তকে। যথাসময়েই চারুদত্ত হাজির হলেন

বিচারকের দরবারে—পথে দেখা নানা ছুর্লক্ষণ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বিচারক তাঁকে সসম্মানে উপযুক্ত আসন দিলেন—কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শকার—হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে চারুদত্তের উপর অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করে চলে এই ছুর্বৃত্ত। ইতিমধ্যে বসন্তসেনার মাকেও ডেকে আনা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে। তার কাছ থেকে জানা গেল—বসন্তসেনা চারুদত্তের অভিসারেই রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু এখনও ফিরে আসেন নি। সত্যনিষ্ঠ চারুদত্তও একথার সত্যতা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তারপর কি হলো বসন্তসেনার—তবে কি সত্যিই চারুদত্ত তাঁকে গয়নার লোভে মেরে ফেলেছেন ?—সবার মনেই এই প্রশ্ন। অবস্থা আরও জটিল করে তুলতেই যেন চন্দনকের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্যে সেই সেনাপতি বীরক এসে উপস্থিত যার সঙ্গে চারুদত্তের গাড়ীসংক্রান্ত ব্যাপারে চন্দনকের ঝগড়া হয়েছিল। সে জানায়—পথে একটি গাড়ি সে আটকিয়েছিল যেটিতে চড়ে বসন্তসেনা চারুদত্তের উদ্দেশ্যে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে যাচ্ছেন শুনে চন্দনক ছেড়ে দিয়েছিল। বিচারক ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠ্ছেন—ঘটনাগুলি তো ক্রমশ চারুদত্তের বিপক্ষেই যাচ্ছে। তবুও তিনি লোক পাঠালেন সেই উদ্যানে দেখে আসার জন্যে সত্যিই কোনো রমণীর মৃতদেহ পড়ে আছে কি না। সে ফিরে এসে জানায়—প্রকৃতই একটি বিকৃত দেহ সেখানে পড়ে আছে যেটি শেয়াল-শকুনিতে খেয়ে ফেলেছে—শুধু চুল ও অবশিষ্ট হাত পায়ের অংশ দেখে অনুমান করা যাচ্ছে দেহটি কোনো নারীর। অবস্থা উঠ্লো চরমে যখন বিদূষক মৈত্রেয় চারুদত্তের বিচারালয়ে আসার খবর পেয়ে ছুটে এলো। এইসময় সে চারুদত্তের অনুরোধে বসন্তসেনাকে প্রত্যর্পণ করতে যাচ্ছিল সেই অলঙ্কারগুলি—যেগুলি তিনি পুত্র রোহসেনের কান্না দেখে সোনার গাড়ী গড়িয়ে খেলার জন্যে দিয়ে এসেছিলেন। পথে চারুদত্তের খবর পেয়ে সে সোজা আদালতে হাজির। অভিযোগ শুনেই শকারের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় বিদূষকের—ক্রমশ

হাতাহাতি বেধে ওঠে। ধাক্কাধাক্কির ফলে মৈত্রেয়ের কোমরের পুঁটুলীটি খুলে গিয়ে সব গয়না পড়ে গেল—শকারের তো পোয়া-বারো—চারুদত্তের বিরুদ্ধে প্রমাণ যেন নিজেই হেঁটে এসে গেছে।

সে গয়নাগুলি দেখিয়ে বলে ওঠে—'এগুলিই তো সেই বেশ্যার গয়না—যেগুলির লোভে চারুদত্ত তাকে খুন করেছে। সাক্ষী মানা হয় বসন্তসেনার মাকে। সনাক্ত করা ছাড়া তারও আর কিছুই করার থাকে না। অতএব আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায়ই আর চারুদত্তের নেই। কিন্তু সহানুভূতিশীল বিচারক চরম আদেশ দেওয়ার জন্যে রাজা পালকের কাছে মোকদ্দমাটি পাঠিয়ে দেন। সব ঘটনা শুনে রাজা রায় দিলেন—'গয়নাগুলি গলায় বেঁধে দিয়ে চারুদত্তকে শূলে চড়াতে হবে—লোভীদের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে এই শাস্তি।' শকারের আনন্দ দেখে কে! তার উদ্দেশ্য সফল হলো এবার। বিলাপরত মৈত্রেয়কে সান্ত্বনা দিয়ে তার ওপর স্ত্রীপুত্রের দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন চারুদত্ত—এবার নিজেকে প্রস্তুত করেন বিনা অপরাধে শাস্তিগ্রহণের জন্যে। চণ্ডালেরা এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে থাকে বধ্যভূমির দিকে। প্রথা অনুসারে তাঁর দেহে রক্তচন্দনের প্রলেপ দিয়ে তার ওপর চাল ছড়িয়ে গলায় করবীর মালা পরিয়ে রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে—চারুদত্তের এ হেন লাঞ্ছনায় পুরবাসীরা অনেকেই শোকার্ত—কিন্তু রাজশাসনের কাছে তারা নিরুপায়। পুত্র রোহসেনকে নিয়ে মৈত্রেয় দৌড়ে আসেন চারুদত্তের কাছে—পুত্রমুখ দর্শনের আশায় চণ্ডালদের কাছে কিছু সময় প্রার্থনা করেন চারুদত্ত। বালকের করুণ উক্তিতে বুঝি পাথরও ফেটে যায়—'আমার বাবাকে ছেড়ে দাও, আমাকে বরং মেরে ফেল।' চারুদত্তের চোখে জল—সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। চণ্ডালদের কঠিন হৃদয়ও কোমল হয়ে ওঠে এই দৃশ্যে। কিন্তু কর্তব্যের ডাকে তাদের টেনে নিয়ে যেতে হয় চারুদত্তকে।

কুকর্মের সাক্ষী ভৃত্য স্থাবরককে শকার যে বাড়ীতে বন্দী করে রেখেছিল সে বাড়ীর সামনে এসে চণ্ডালরা যখন ডিণ্ডিম বাজিয়ে ঘোষণা করতে থাকে রাজাদেশ—তখন স্থাবরক আর স্থির থাক্‌তে পারে না। চীৎকার করে সে জানাতে থাকে আসল ঘটনা—কিন্তু সমবেত জনতার হট্টগোলে চাপা পড়ে যায় তার কণ্ঠস্বর। উপায়ান্তর না দেখে সে হাত বাঁধা অবস্থাতেই জানলা দিয়ে লাফ দিল—আঘাত খুব মারাত্মক না হলেও হাতের শিকলটি যাহোক ভেঙে গেল—অম্‌নি ছুটে এসে সে সবাইকে বলতে থাকে—চারুদত্ত নির্দোষ—কুকীর্তি আসলে শকারেরই। চারুদত্তের নিধনপর্ব প্রত্যক্ষ করার জন্যে শকারও ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে—সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—'আসলে সোনা চুরি করায় ওকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল—এখন সুযোগ বুঝে মনিবের নামে অপবাদ দিচ্ছে।' আড়ালে ডেকে স্থাবরকের হাতে জোর করে একটি সোনার বালা ধরিয়ে দিয়ে তাকে চুপ করে থাক্‌তে বলে—কিন্তু ধর্মভীরু স্থাবরক সকলকে সেই সোনার বালাটি দেখিয়ে বলে, 'শালা মশাই এইটি ঘুষ দিয়ে আমাকে বশ করতে চাইছেন।' শকারেরও কূটবুদ্ধির অভাব নেই, সেও তক্ষুণি বলে বসে—'এইটিই তো সেই বালা যেটি চুরি করার জন্যে একে শাস্তি দেওয়া হয়েছে'—এইভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চণ্ডালদের ওপর হুকুম চালায়—'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজাদেশ পালন করে চারুদত্তকে হত্যা কর।' চাপা পড়ে গেল স্থাবরকের চেষ্টা ; চারুদত্তকে বুঝি অন্যায় শাস্তি থেকে বাঁচান গেল না। অবশেষে দলটি পৌঁছাল বধ্যভূমির সামনে—শ্মশানের দৃশ্য নারকীয়—অর্ধভুক্ত শব—শূলে বীভৎস নগ্ন দেহ—শৃগাল-কুক্কুরের বিচরণে ভয়ঙ্কর। শেষবারের মত দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করতে থাকে চণ্ডালেরা—এর পরেই নেমে আসবে ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্র। কিন্তু চারুদত্তের মত সজ্জন ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত করতে নিষ্ঠুর চণ্ডালেরাও বুঝি দ্বিধাগ্রস্ত। তাই প্রথমে তারা কালক্ষেপ করতে থাকে কার আঘাতের পালা—

এই নিয়ে তর্ক। যদিও বা এই প্রসঙ্গের একটা মীমাংসা হ'লো একজন আরেকজনকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে। তার বাবা তাকে বলে গেছেন যে অপরাধীকে হত্যার আগে কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিত; কারণ অনেক সময় রাজার জয়লাভ, পুত্রপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়—আবার কখনও বা রাজার পরিবর্তন হওয়ায় নতুন রাজা সব অপরাধীদের ছেড়ে দেন। কিন্তু শকার অনবরতই তাড়া দিতে থাকে, কাজেই বেশীক্ষণ আর তাদের এভাবে কালক্ষেপ করা চল্‌ল না—কি আশ্চর্য! চরম আঘাত হানার জন্যে খড়্গ তুলতেই চণ্ডালের হাত থেকে সেটি পড়ে গেল। তখন যেই শূলে গাঁথার জন্যে চারুদত্তকে ধরা হয়েছে তখুনি দূর থেকে শোনা গেল নারীকণ্ঠের কাতর অনুরোধ—ওঁকে মেরো না, মেরো না; যে হতভাগিনীর জন্যে ওঁর হত্যার আদেশ সেই আমি বেঁচে আছি।' চণ্ডালরা বসন্তসেনাকে দেখে চম্‌কে উঠে, চারুদত্তকে ছেড়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে বসন্তসেনা চারুদত্তের পায়ে পড়েন। চারুদত্তও বিস্মিত—একি সত্যি! বসন্তসেনা কি প্রকৃতই জীবিতা, না তাঁকে রক্ষা করার জন্যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন কোনো দেবী! কিন্তু স্পর্শ পেয়ে সব ভ্রম হ'লো দূর—আবেগে দু'জনের কণ্ঠ রুদ্ধ। বসন্তসেনার সঙ্গে ছিল সেই উদ্ধারকর্তা ভিক্ষু—সে চারুদত্তকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানাল। বেগতিক দেখে শকার তো দে চম্পট—কিন্তু চণ্ডালরা এবার আসল খুনীর সন্ধান পেয়ে ছুটে গেল তাকে ধরবার জন্যে।

চারিদিকে খুবই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে—শর্বিলক আর্যককে মুক্ত করার পর দু'জনে মিলে রাজা পালককেও নিহত করেছে—আর্যকই এখন রাজা। শর্বিলক ছুটে এসে চারুদত্তকে মুক্ত করে দেয়। ইতিমধ্যে বসন্তসেনার সঙ্গে মিলন হয়েছে চারুদত্তের। রাজপ্রতিনিধিরূপে শর্বিলক বসন্তসেনাকে বধূর মর্যাদা দিয়ে অবগুণ্ঠন টেনে দেয়—চারুদত্তের ব্রাহ্মণী ধূতাও সাদরে অন্তঃপুরে গ্রহণ করেন

বসন্তসেনাকে। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে আর্যক ঐ দেশের দায়িত্ব ভার চারুদত্তের ওপরই সমর্পণ করে—শুধু তাই নয়, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই উদ্ধারকারী ভিক্ষু সমস্ত বৌদ্ধ মঠের কর্তৃত্ব লাভ করে,—স্থাবরক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, চন্দনক পায় প্রধান সেনাপতির পদ। আর শকার? চণ্ডালরা ধরে আনার পর শর্বিলক শাস্তি দিতে উদ্যত হলে এই কাপুরুষ চারুদত্তেরই পায়ে এসে পড়ল। 'শরণাগতের ভয় নাই'—অতএব শরণাগত-বৎসল চারুদত্ত শকারকেও অব্যাহতি দিলেন।

রত্নাবলী

সাগরের জল থেকে যাকে পাওয়া গেল, তার নাম 'সাগরিকা' ছাড়া আর কিই বা দেওয়া চলে? কৌশাম্বী দেশের জনৈক বণিক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে আনলেন পরমসুন্দরী এক কন্যাকে—রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের আজ্ঞা অনুসারে সে কন্যা স্থান পেল রাজ-অন্তঃপুরে—রাজ্ঞী বাসবদত্তার সহচারিণীরূপে, কিন্তু কেউ জানতে পারল না এই কন্যার পরিচয়। রাজ্ঞীও তাঁকে সযত্নে রক্ষা করে চলেন চঞ্চলমতি রাজা উদয়নের দৃষ্টিপথ থেকে।

বৎস রাজ্যে মদনোৎসব—নরনারী আনন্দমত্ত। উৎসব দিবসে রাজ্ঞী বাসবদত্তা এসেছেন মকরন্দ উদ্যানে পুষ্পধনুর অর্চনার উদ্দেশ্যে। দেবীর আহ্বানে রাজা উদয়ন ও বিদূষক এলেন এই কাননে। কামদেবের আরাধনার পর রাজ্ঞী উদয়নকেও পুষ্পচন্দনে পূজা করলেন। এবার বুঝি রাজার দৃষ্টি থেকে সাগরিকাকে দূরে রাখার প্রয়াস ব্যর্থ হতে চলেছে। সখী সুসঙ্গতার সঙ্গে সাগরিকাও আসছিলেন সেই উদ্যানে—আড়াল থেকে দেখলেন তিনি রাজাকে—অতনু যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে কাননভূমি আলোকিত করে বসেছেন। মুগ্ধ হলেন তিনি। বিধাতা বুঝি রাজা উদয়নের বক্ষের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন এই সাগর-সেঁচা রত্নহার 'সাগরিকা'।

মদনশরে আহতা 'সাগরিকা কদলীকুঞ্জে এসে রাজার ছবি এঁকে ভুলতে চাইলেন প্রার্থিত পুরুষকে না পাওয়ার বেদনা, কিন্তু সখী সুসঙ্গতাকে এড়িয়ে থাকা গেল না। সুসঙ্গতা সেখানে এসে সহজেই বুঝতে পারল সখীর মনোভাব—কৌতুকে সে রাজার চিত্রের পাশে এঁকে দিল সাগরিকার আলেখ্য—যেন কামদেবের পাশে রতিদেবী। গোপনতার আবরণ গেল উড়ে—অকপটেই সাগরিকা সখীর কাছে

প্রকাশ করলেন রাজা উদয়নের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের কথা। সুসঙ্গতার খাঁচায় ছিল পোষা সারিকাটি—যে কোন কথা শুনে মানুষের ভাষার পুনরাবৃত্তি করাই এই পাখীটির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁদের এই নিভৃত আলাপের রেশটুকু ছিঁড়ে গেল এক উচ্চকিত ঘোষণায়—পশুশালা থেকে খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে এক হিংস্র বানর—সামনে যা পাচ্ছে সব কিছুই সে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে। ভীত হয়ে সাগরিকা ও সুসঙ্গতা আশ্রয় নিলেন নিকটেরই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন তমালবৃক্ষের তলে। পিছনে ফেলে গেলেন সেই আলেখ্য ও খাঁচার আবদ্ধ সারিকাটিকে। দুষ্ট বানরটি সেইখানে এসে কঠিন আঘাতে খাঁচাটির অর্গল দিল ভেঙে, সারিকাটিও মুক্তি পেয়ে উড়ে গিয়ে বসল গাছের ডালে, বানরটি চলে গেল অন্যদিকে।

বিলাস ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাজাও বিদূষকসহ এলেন সেই উদ্যানে। পিঞ্জরমুক্ত সারিকাটি একটি গাছের ডালে বসে পুনরুক্তি করে যাচ্ছিল সুসঙ্গতার কাছে বলা সাগরিকার কথাগুলির। রাজা ও বিদূষক বুঝলেন—কোনো প্রেমাতুরা নারী দয়িতকে পাওয়ার আশায় নিরাশ হয়ে ব্যক্ত করেছে তার গোপন ব্যথা—সারিকাটি সেগুলিই মানুষের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। কিন্তু কে এই হতাশ নায়িকা? তার বাঞ্ছিত পুরুষই বা কোন্ ভাগ্যবান? সব সন্দেহের নিরসন হলো ফেলে-যাওয়া 'ছবিটি দেখে। রাজা উদয়নকেই তো ধরে রাখা হয়েছে নিপুণ তুলিকায়! তবে পার্শ্ববর্তিনী এই বরনারীর অপরূপ দেহ-সুষমা তো ইতিপূর্বে রাজার দৃষ্টিপথে আসেনি। রাজহংসীর মতই লীলাময়ী, রূপে লক্ষ্মীকেও যেন পরাজিত করে—সেই চিত্ররূপা সুতনূ, রাজার মানসসরে স্থায়ী আশ্রয় লাভ করলেন। বিদূষকের কাছে রাজা প্রকাশ করে চলেন অপ্রাপ্যা এই কল্পসুন্দরীর জন্যে তাঁর আন্তরিক অভিলাষের কথা। অন্তরাল থেকে সাগরিকা ও সুসঙ্গতা আত্মপ্রকাশ করে চিত্রফলকটির দাবি জানায়। দেবী বাসবদত্তার পরিচারিকারূপেই সুসঙ্গতা পরিচিতা—কাজেই রাজা ও বিদূষক

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন তার আগমনে। কিন্তু অভয় দিয়ে সুসঙ্গতা জানাল—সাগরিকার দূতীরূপেই সে এসেছে—কাছেই আছে সাগরিকা। সাগ্রহে রাজা এগিয়ে চলেন—সঙ্গে বিদূষক ও পথপ্রদর্শিকা সুসঙ্গতা। অল্পক্ষণ পরেই তিনি দেখলেন—সেই চিত্র যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে তাঁর সামনে—রূপের ছটায় উদ্যান উজ্জ্বল করে প্রতীক্ষা করছেন বরবর্ণিনী সাগরিকা—মোহাবিষ্টের মতই এগিয়ে এসে রাজা সাগরিকার একটি হস্ত ধারণ করলেন—কেটে যায় কয়েকটি মুগ্ধ মুহূর্ত। সহসা সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিদূষক প্রকাশ করে বসল তার চমৎকৃতি—'আহা ঠিক যেন সেই বাসবদত্তা।' —সচকিত হয়ে উঠল সকলে। রাজ্ঞীর আগমন সম্ভাবনায় ভীত হয়ে ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হলেন সাগরিকা ও সুসঙ্গতা। ক্ষুব্ধ মনে রাজা দোষারোপ করলেন বিদূষককে। কিন্তু সম্ভাবনাই হলো সত্যি—রাজ্ঞী বাসবদত্তা অনুগতা কাঞ্চনমালাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেইস্থানে রাজার অন্বেষণে। সেই চিত্রফলকটি গোপন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন রাজা—কিন্তু বিদূষকের অনবধানতায় তাঁর চেষ্টা হলো বিফল। কাঞ্চনমালা রাজ্ঞীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চিত্রটির দিকে। সবিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করেন—'রাজার পাশে আঁকা ছবিটি কার কীর্তি?' সন্দেহ দেখা দেয় তাঁর মনে—এ পর্যন্ত তো রাজার দৃষ্টিপথে আসতে দেননি সাগরিকাকে। সত্য গোপন করে রাজা বলেন—এই নারী সম্পূর্ণরূপে তাঁর কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু এই দুর্বল যুক্তিতে রাজ্ঞীর সন্দেহ দূর হয় না—শিরঃপীড়ার অজুহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সাগরিকার জন্যে প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হতে থাকেন রাজা উদয়ন। বিরহকাতরতা সাগরিকার জীবনকেও অসহনীয় করে তোলে; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মিলনের কোন পথই খোলা নেই। অবশেষে পৌর-জনদের সন্দেহের হাত এড়িয়ে রাজার ও সাগরিকার মিলনের এক উপায় উদ্ভাবন করে সুসঙ্গতা। উপহারস্বরূপ বাসবদত্তার কাছ থেকে যে পরিচ্ছদ লাভ হয়েছিল, তাই দিয়ে সাগরিকা সাজবেন বাসবদত্তা,

আর সুসঙ্গতা নিজে কাঞ্চনমালার বেশে তাঁকে অনুসরণ করবে। বিদূষকের মাধ্যমে রাজাকে এই সংবাদ প্রেরণ করা হলো। কিন্তু কোনও ক্রমে কাঞ্চনমালার কর্ণগোচর হলো এই পরিকল্পনা—ফলে এক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। যথাসময়ে পূর্ব-সঙ্কেতিত স্থানে রাজা বিদূষক সহ উপস্থিত। আশু মিলনের আনন্দে অধীর তাঁর চিত্ত। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালা —এঁদের ছদ্মবেশিনী সাগরিকা ও সুসঙ্গতা ভেবে রাজা নিঃশঙ্কচিত্তে সাগরিকার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে চলেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নিস্তব্ধ বাসবদত্তা। কিন্তু রাজার উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অবশেষে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। নিজেকে প্রকাশিত করে ক্ষুব্ধ অন্তরে রাজার কাছে বিদায় প্রার্থনা করেন। রাজা স্তম্ভিত, রাজ্ঞীর ক্রোধের আশঙ্কায় বিহ্বল, রাজার শত অনুনয় সত্ত্বেও বাসবদত্তার ক্রোধ প্রশমিত হলো না—সবেগে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সাগরিকা জানতে পারলেন—সঙ্কেতের বিষয় দেবীর কাছে গোপন নেই, ফলে সুসঙ্গতা লাঞ্ছিতা। এবার বোধহয় তাঁর পালা। অপমানের আশঙ্কায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করাই স্থির করেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে তিনি এলেন সেই উদ্যানে—পরনে বাসবদত্তার ছদ্মবেশ। বৃক্ষশাখাটি ধরে প্রাণবিসর্জনের পূর্ব মুহূর্তে বিলাপ করে চলেন প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে, দূর থেকে বিদূষক ও রাজা এ দৃশ্য দেখতে পেলেন —এবারও তাঁদের ভ্রম হলো। প্রকৃত বাসবদত্তাই বুঝি রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন—এই কথা ভেবে কর্তব্যবোধে তাঁকে নিরস্ত করতে এগিয়ে এলেন রাজা—প্রিয়স্পর্শ লাগল সাগরিকার দেহে—মুহূর্তের জন্যে জগৎ সংসার বিস্মৃত হলেন তিনি—অবগুণ্ঠন গেল সরে। সহর্ষে রাজা দেখলেন—তাঁরই ঈপ্সিতা সাগরিকা। এ যে মেঘ না হতেই জল! আনন্দের আতিশয্যে রাজা দিশাহারা। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজা প্রকাশ করেন সাগরিকার প্রতি অদম্য আকর্ষণের কথা। বাসবদত্তার প্রতি তাঁর প্রেম আর

বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। ভাগ্যের পরিহাসে সেই সময়ে বাসবদত্তা আসছিলেন তাঁর রূঢ় ব্যবহারের জন্য রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে—অল্প দূর থেকে রাজার সমস্ত উচ্ছ্বাসই তাঁর কর্ণগোচর হল। আর সংযত রাখতে পারেন না নিজেকে—দারুণ ভৎর্সনায় রাজাকে স্তব্ধ করে দিয়ে বিদূষক ও সাগরিকাকে বন্দী করে রাখার আদেশ দিলেন। বিমূঢ় রাজা ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক্।

দিনের পর দিন যায়—সাগরিকার কোন সংবাদ না পেয়ে রাজা বিচলিত। শুধু এইটুকু জানতে পারলেন যে, বাসবদত্তা রটনা করেছেন—সাগরিকাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করা হয়েছে। রাজার বহু কাতর অনুনয়ে বিদূষক মুক্তিলাভ করলেন। বিদায়কালে সখীর কাছে উদ্ধার-প্রাপ্তা সাগরিকা বিদূষককে দেওয়ার জন্য নিজের কণ্ঠহার অর্পণ করে গেলেন। সরাসরি রাজার হাতে মালা দেওয়ার সাহস হবে কি করে সাগরজল থেকে উদ্ধার-করা অজ্ঞাতপরিচয় এই তরুণীর? বিদূষকের কণ্ঠে সেই অপূর্ব রত্নাবলী দেখে রাজা বুঝলেন—এর অধিকারিণী নিশ্চয় কোন উচ্চকুলসম্ভূতা। আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে রাজার কাছে সাগরিকার বিয়োগ-ব্যথা। তাঁকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করবার জন্য রাজ্ঞী এক ঐন্দ্রজালিকের যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। রাজ্ঞীর আগ্রহাতিশয্যে অনিচ্ছুকচিত্তে রাজাকে রাজী হতে হলো। উৎসাহভরে ঐন্দ্রজালিক উজাড় করে দেয় তার যাদুবিদ্যার ভাণ্ডার—মায়াবলে সৃষ্টি করে চলে স্বর্গলোক।—পদ্মাসন ব্রহ্মা, শঙ্খপদ্মগদা-চক্রশোভিত বিষ্ণু, চন্দ্রচূড় মহাদেব—ইন্দ্র ও অন্য দেবদেবীর মূর্তি দেখে সকলে চমৎকৃত। কিন্তু বেশীক্ষণ রাজার মনোরঞ্জনের সুযোগ তার হলো না। খবর এল সিংহলের রাজমন্ত্রী বসুভূতি ও কঞ্চুকী বাভ্রব্য রাজদর্শনের অভিলাষী। অতএব বিদায় নিতে হল ঐন্দ্রজালিককে—কিন্তু ঘোষণা করে গেল, আরেকটি বিদ্যা সে অবশ্য দেখাবে মহারাজকে—'এক্কো উণ খেলণও অবস্‌সং দেবেণ পেক্‌খিদব্বো।'

বাসবদত্তার মাতুল সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর মন্ত্রী বসুভূতি

কঞ্চুকীসহ প্রবেশ করেন। প্রথমেই তাকে আকৃষ্ট করে বিদূষকের কণ্ঠে লম্বমান মালাটি—বিস্মিত হয়ে তিনি ভাবেন—ঠিক এইরকম রত্নহারই তো বিক্রমবাহু দিয়েছিলেন তাঁর কন্যা রত্নাবলীকে। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর মহামন্ত্রী প্রকাশ করেন সিংহলরাজের জীবনে চরম বিপর্যয়ের সংবাদ। কৌশাম্বী রাজ্যের প্রধান সচিব যৌগন্ধরায়ণ রাজা উদয়নের জন্য সিংহলরাজ কন্যার পাণি প্রার্থনা করছিলেন, কারণ তিনি জানতেন এই কন্যা সম্বন্ধে গণৎকারদের ভবিষ্যদ্‌বাণী—"যোঽস্যাঃ পাণিগ্রহণং করিষ্যতি স সার্বভৌমো রাজা ভবিষ্যতি।" এই কন্যার পাণিগ্রহণকারী রাজা নৃপতিকুলে সার্বভৌমত্ব লাভ করবেন। কিন্তু আত্মীয়কন্যা বাসবদত্তার ক্ষোভের আশঙ্কায় বিক্রমবাহু এ প্রস্তাবে রাজী হননি। যৌগন্ধরায়ণ তখন লাবাণক গ্রামদাহে বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ রটনা করে দিলেন। ফলে রাজা উদয়নের সঙ্গে সম্পর্ক-লোপের আশঙ্কায় বিক্রমবাহু কন্যা রত্নাবলীকে প্রেরণ করলেন উদয়নের সঙ্গে বিবাহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথে রত্নাবলীর সমুদ্রপোত জলমগ্ন হয়ে পড়ে—তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। এই দারুণ দুঃসংবাদে রাজ্ঞী বাসবদত্তা ও রাজা উদয়ন দু'জনেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে আবার শোনা গেল এক শোচনীয় সংবাদ—অন্তঃপুরে আগুন লেগেছে—লেলিহান শিখায় গ্রাস করে চলেছে সমস্ত কিছু। সকলেই স্তম্ভিত। ভয়বিহ্বলা রাজ্ঞী বাসবদত্তা প্রকাশ করে ফেলেন—সাগরিকাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণের সংবাদ মিথ্যা রটনা, অন্তঃপুরেই তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। উদয়ন আর স্থির থাকতে পারেন না—সাগরিকাকে উদ্ধারের জন্যে ঝাঁপ দিতে যান সেই আগুনের মধ্যেই। রাজ্ঞী বাসবদত্তা, সিংহলমন্ত্রী, বিদূষক ইত্যাদিরাও অগ্রসর হন। রাজা দেখেন শৃঙ্খলসহ সাগরিকা সেই অগ্নিতে প্রাণবিসর্জনে উৎসুক—সবলে রাজা বাধা দেন তাঁকে। কিন্তু সহসা দেখা গেল, সেই সর্বগ্রাসী অগ্নির লেশমাত্রও নাই—চারিদিক্ সম্পূর্ণ শান্ত। সকলেই বিস্মিত। বাসবদত্তা বুঝতে পারেন—এ সেই

ঐন্দ্রজালিকের কীর্তি—যে বলেছিল আরও একটি খেলা সে রাজাকে দেখাবে। কিন্তু সিংহলরাজের মন্ত্রী চমকিত হয়ে উঠলেন কেন? যখন জানলেন, এই কন্যাকে সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন 'সিংহলেশ্বর-দুহিতা রত্নাবলীয়ম্ ।' এইতো আমাদের হারানো রাজকন্যা রত্নাবলী। প্রিয়জনকে পুনঃপ্রাপ্তির আনন্দে সকলে আনন্দ-বিহ্বল। —সাদরে রাজ্ঞী মাতুলকন্যা রত্নাবলীকে গ্রহণ করেন—রাজার সঙ্গে মিলনের পথে আর কোন অন্তরায়ই রইল না। কূটকৌশলী অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ এসে ক্ষমা-প্রার্থনা করেন সাগরিকার পরিচয় গোপন রাখার জন্য, কিন্তু তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই প্রভুভক্তি-প্রণোদিত, অতএব ক্ষমার্হ।

রাজা উদয়ন এখন বিক্রমবাহুকে মিত্ররূপে ও রত্নাবলীকে প্রিয়ারূপে লাভ করে, রাজ্ঞী বাসবদত্তাকেও তাঁর ভগিনী লাভে প্রীত করে, যৌগন্ধরায়ণের মত অমাত্যশ্রেষ্ঠের সহায়তায় নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

মুদ্রারাক্ষস

কৌটিল্য তথা চাণক্যই পেরেছিলেন কুটিল রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে। মগধরাজ নন্দের দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে শিখা উন্মোচিত করে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, নন্দবংশের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধনের পর নন্দের শূদ্রপত্নী মুরার গর্ভজাত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো। কিন্তু আরও একটি কর্তব্য বাকি। নন্দরাজদের একান্ত অনুগত মন্ত্রী রাক্ষস। ব্রাহ্মণবংশজ রাক্ষস শুধু শাস্ত্রবিৎই ছিলেন না, শস্ত্রবিদ্যায়ও তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা, আর অমাত্যরূপে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন চাণক্যের যথার্থ সমকক্ষ। এহেন ব্যক্তিকে মন্ত্রিরূপে লাভ করা সম্ভব না হলে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু রাক্ষস প্রভুহন্তা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে তার উচ্ছেদসাধনের প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিলেন, অতএব রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষভুক্ত করার জন্য চাণক্য নানা কৌশলের জাল বিস্তার করে চলেন।

সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল চাণক্যের চর—নানা ছদ্মবেশে। চন্দ্রগুপ্তের উন্নতিতে বিরূপ—এমন কারও সন্ধান পেলেই তাদের শাস্তি-বিধান করা হতো। এইরকমই একজন চর যমপট সঙ্গে নিয়ে নগরবাসীদের দ্বারে যম রাজার মাহাত্ম্য কীর্তন করে আর গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে চলে। একদিন কুসুমপুর নগরের মণিকার ও রাক্ষসের পরম সুহৃদ চন্দনদাসের গৃহে এলো এই চর। পট উন্মুক্ত করে গান করার সময় কক্ষের ভিতর থেকে বাইরে আসে এক উৎসুক শিশু, তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় এক মহিলার হাত থেকে ছিটকে এসে পড়ল একটি অঙ্গুরীয়ক, যাতে রাক্ষসের নামমুদ্রা অঙ্কিত। চর সেটি সংগ্রহ করে এনে দিল চাণক্যকে। প্রাজ্ঞ এই

ব্রাহ্মণের বুঝতে বাকী থাকে না যে অমাত্য রাক্ষস পার্বত্য রাজ্যের কুমার মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাঁর পরিবারের লোকজন বণিক চন্দনদাসের গৃহে সুরক্ষিত। চাণক্য সাগ্রহে গ্রহণ করলেন সেই অঙ্গুরীয়ক—তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে আশার দীপশিখা। তিনি তৎক্ষণাৎ সদ্ব্যবহার করলেন সেই সুযোগের। রাক্ষসের অন্যতম সুহৃদ শকটদাসকে বন্দী করা হয়েছিল—অনুচর সিদ্ধার্থককে চাণক্য আদেশ করলেন এই শকটদাসকে দিয়ে শিরোনামবিহীন ও পত্রলেখকের স্বাক্ষর ব্যতীতই কয়েকটি কথা লিখিয়ে নিতে। শোভন হস্তাক্ষরের অজুহাতে বন্দী শকটদাসকে দিয়ে সহজেই কার্যসিদ্ধি করান হল। সেই পত্রে রাক্ষসের নামমুদ্রার ছাপ দিয়ে সিদ্ধার্থককে অর্পণ করলেন চাণক্য। নির্দেশ দিলেন—'শকটদাসকে যখন বধ্য-স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন সিদ্ধার্থক ইঙ্গিত করলে ঘাতকরা পলায়নের ভাণ করবে—সিদ্ধার্থক তখন সহজেই শকটদাসকে উদ্ধার করে উপস্থিত করবে রাক্ষসের কাছে, আর সেই মুদ্রাঙ্কিত আংটিটিও বন্ধুকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর বিশ্বাস অর্জনের পর তাঁরই অধীনে কোন কর্ম গ্রহণ করবে।' সিদ্ধার্থক যাত্রা করে তাঁর নির্দেশিত পথে।

এবার চাণক্য আহ্বান জানালেন চন্দনদাসকে। সন্ত্রস্ত চিত্তে প্রবেশ করেন নগরীর শ্রেষ্ঠ মণিকার—কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই চাণক্য জানালেন আসল দাবী—'রাক্ষসের পরিজনকে সমর্পণ কর।' সম্পূর্ণ অস্বীকার করার প্রয়াস সম্ভব হলো না। কিন্তু চাণক্যের ভীতি-প্রদর্শন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও চন্দনদাস অনমনীয়। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন—'সন্তমপি গেহে অমাত্যরাক্ষসস্য গৃহজনং ন সমর্পয়ামি, কিং পুনরসন্তম্।' অমাত্য রাক্ষসের পরিজনেরা আমার গৃহে নাই, থাকলেও দিতাম না। অতএব স্ত্রী-পুত্র সহ চন্দনদাসকে বন্দী করে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন চাণক্য।

পার্বত্য রাজ্যের রাজা পর্বতকের পুত্র মলয়কেতু। পর্বতক চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন নন্দরাজবংশের বিরুদ্ধে,

সর্ত ছিল তাঁকে অর্ধ রাজ্য দানের। কিন্তু চাণক্যের কৌশলে তা সম্ভব হলো না। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের হত্যার জন্য প্রেরণ করেছিলেন এক একঘ্নী বিষকন্যা,—চাণক্য পূর্ব থেকে এ সংবাদ অবগত হয়ে সে কন্যাকে প্রয়োগ করলেন পর্বতকের বিরুদ্ধে। পর্বতক এইভাবে নিহত হওয়ায় পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে রাক্ষসের সঙ্গে মিলিত হলেন মলয়কেতু।

রাক্ষস আশ্রয় নিলেন তাঁরই রাজধানীতে। রাক্ষসের চর বিরাধগুপ্ত সাপুড়ের ছদ্মবেশে সংগ্রহ করে আনে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী কুসুমপুরের খবরাখবর, চন্দ্রগুপ্তকে বিনাশের জন্য রাক্ষসের সমস্ত কৌশলই চাণক্যের কূটবুদ্ধির বর্মে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ হয়েছে। বিরাধগুপ্ত বিবৃত করে চলে সমস্ত ঘটনা—পর্বতরাজ পর্বতকের সৈন্যবৃন্দ শক, যবন ও পারসীক সৈন্যদের মিলিত বাহিনী বাঁধ্‌-ভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতই কুসুমপুর আক্রমণ করল—চলল অবরোধ। তৎকালীন নন্দবংশীয় রাজা সর্বার্থসিদ্ধি অত্যাচার প্রতিহত করতে অসমর্থ হলেন। তিনি সুড়ঙ্গ পথে নগরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তপোবনে আশ্রয় নিলেন। নগরী চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে এলো।

চাণক্য নির্দেশ দিলেন—অর্ধরাত্রের সুলগ্নে চন্দ্রগুপ্ত রাজা রূপে নগরে প্রবেশ করবেন। সূত্রধারদের আদেশ দেওয়া হলো রাজপুরীর তোরণদ্বারগুলির সংস্কার-সাধনের পর সুসজ্জিত করার। রাক্ষসের অনুগত সূত্রধার দারুবর্মা রাজপুরীর পূর্ব তোরণদ্বার নির্মাণ করে স্থির করল—চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশমাত্র উপর থেকে যন্ত্রসাহায্যে ওই তোরণ তাঁর ওপর নিক্ষেপ করবে। দারুবর্মার অতিরিক্ত তৎপরতা চাণক্যকে সন্দিহান করে তুলল, ফলে রাতারাতি চাণক্য পর্বতকের ভাই বৈরোচককে অর্ধ রাজ্য দান করে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করলেন। রাজবেশে সুসজ্জিত করার পর চন্দ্রগুপ্তের বাহক হস্তীর উপর বসিয়ে তাঁকে রাজধানীর দিকে যাত্রা করিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের অনুগামী—রাজন্যবৃন্দ, বৈরোচককেও চেনা যাচ্ছিল না।

নির্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসে সেই তোরণের কাছে—রাজন্যবর্গকে বাইরে রেখে চন্দ্রগুপ্তের হস্তী চন্দ্রলেখা তার আরোহীকে নিয়ে প্রবেশ করে—মাহুত বর্বরক চন্দ্রগুপ্তভ্রমে গুপ্ত ছুরিকা নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় বৈরোচককে—এদিকে দারুবর্মা যন্ত্রতোরণ দিয়েছে ছেড়ে—সেটি পড়ল বর্বরকের দেহে—সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। তখন নিরুপায় দারুবর্মা প্রাণভয়ে যন্ত্র চালাবার লোহার শলাকা দিয়ে বৈরোচককে হত্যা করল—তার নিজের পরিণাম হলো আরও শোকাবহ—রাজ-অনুচরদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের আঘাতেই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল।

রাক্ষস আরও কতকগুলি উপায় অবলম্বন করেছিলেন চন্দ্রগুপ্তের নিধনের জন্যে। তাঁর নিযুক্ত যে বৈদ্য বিষমিশ্রিত ঔষধ দিল চন্দ্রগুপ্তের পানের জন্যে—চাণক্য তা স্বর্ণপাত্রে ঢেলে বিবর্ণতা প্রাপ্ত হতে দেখে সহজেই বুঝতে পারলেন বিষের কথা—ঐ ঔষধ প্রয়োগেই হত্যা করা হলো সেই বৈদ্যকে। চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ তৈরী করে বাস করছিলেন বীভৎসক, সুযোগ মত চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার জন্যে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের শয়নের পূর্বেই সেই কক্ষের পরীক্ষায় এসে চাণক্য দেখলেন অন্নকণা নিয়ে পিপীলিকার সারি। চাণক্য সবই বুঝলেন—তাঁর আদেশে সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হলো—দারুণ ধোঁয়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি বীভৎসক মৃত্যুবরণ করল। এইভাবে চাণক্যের সতর্কতার বর্মে প্রতিহত হলো রাক্ষসের সমস্ত নীতিপ্রয়োগ।

শকটদাসের ও চন্দনদাসের সপরিবারে বন্দিত্বের সংবাদে রাক্ষস বিচলিত। এই সময়ই শকটদাসকে মুক্ত করে চাণক্যের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সিদ্ধার্থক রাক্ষসের কাছে উপস্থিত হয় শকটদাস সহ। প্রীত রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে সিদ্ধার্থককে নিজ গাত্র থেকে যে অলঙ্কার দান করলেন তা মলয়কেতুরই প্রদত্ত। সিদ্ধার্থক প্রত্যর্পণ করল রাক্ষসের সেই নামমুদ্রা, বলল চন্দনদাসের বাড়ীর কাছে কুড়িয়ে পেয়েছে। সরল বিশ্বাসে শকটদাসের কাছে রাক্ষস গচ্ছিত রাখলেন সেই

মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, সিদ্ধার্থকের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে কর্মেও নিযুক্ত করলেন—চাণক্যের নীতি-বৃক্ষের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে চলে।

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী কুসুমপুর তথা পাটলীপুত্রে কৌমুদী মহোৎসব। প্রাসাদে আরোহণ করে তিনি শারদীয়া পূর্ণিমার অপূর্ব শোভা উপভোগ করতে থাকেন—অনন্ত নীল আকাশ যেন বিশাল বারিধি, আর শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি যেন সেই সমুদ্রের বালুতট। সারস-পংক্তির সরস গম্ভীর রব যেন তরঙ্গোচ্ছ্বাসেরই ধ্বনি। নক্ষত্রগুলিতে বিকচ কুমুদের শোভা। পূর্ণ জলাশয়গুলি শান্ত, শস্যভারে ক্ষেত্র অবনত—সর্বত্রই পরিপূর্ণতার প্রকাশ। কিন্তু তাঁর আদেশ অনুসারে নগরে উৎসবের কোন আয়োজনই তো দেখা যাচ্ছে না। কঞ্চুকী তাঁর প্রশ্নের উত্তরে জানালেন চাণক্যের নির্দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে উৎসব। চন্দ্রগুপ্ত বুঝি সত্যই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আজ্ঞা লঙ্ঘনে! স্মরণ করলেন চাণক্যকে। চাণক্য এসে স্বীয় প্রভুত্বসূচক যে-সমস্ত উক্তি করলেন তা যেন কুপিত করে তুলল চন্দ্রগুপ্তকে। পরস্পরের প্রতি বিরোধের অভিনয় করে চালাতে থাকেন বাদানুবাদ—অবশেষে অপমানিত ক্রুদ্ধ চাণক্য বিদায় নিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ঘোষণা করলেন, এবার থেকে তিনি নিজেই রাজ্যভার বহন করবেন। নগরবাসীরা নিঃসন্দেহ হয় তাঁদের উভয়ের মতবিরোধ সম্বন্ধে—চর প্রমুখাৎ এ সংবাদ পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠেন রাক্ষস। কিন্তু রাক্ষসকে বিপথে চালিত করার জন্যে এ যে চাণক্যের নীতিবৃক্ষের অন্যতম মূল—এ সম্ভাবনার কথা রাক্ষসের মনে এবারও উদিত হয় না।

মলয়কেতু বিভিন্ন রাজার সহায়তায় বিশাল সৈন্যদল নিয়ে কুসুমপুরের কাছেই শিবির স্থাপন করেছেন—উদ্দেশ্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী আক্রমণ। রাক্ষসও আছেন সেই শিবিরে, ছাড়পত্র ছাড়া সেই শিবিরে গমনাগমন নিষিদ্ধ। মলয়কেতু রাক্ষসের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি, কারণ নন্দবংশের প্রতি রাক্ষসের

অচলা ভক্তি, আর চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রা পত্নীর সন্তান হলেও এই বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাক্ষসের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী চাণক্যও এখন ক্ষমতাচ্যুত। সন্দেহের বীজে জল-সেচন করে কয়েকটি ঘটনার পারম্পর্য। ছাড়পত্র ছাড়াই শিবিরের বাইরে আসার চেষ্টা করায় সিদ্ধার্থককে ধরে নিয়ে আসে প্রহরী। সঙ্গে শিরোনামহীন সেই পত্র ও অলঙ্কারের পুটুলী। শকটদাসকে দিয়ে লেখান ও রাক্ষসের নামমুদ্রাঙ্কিত সেই পত্রের মর্মার্থ—মলয়কেতুর সহায়ক রাজারা নিজেদের মধ্যে মলয়কেতুর রাজ্য, হস্তী ও অশ্বগুলি বণ্টন করে নিতে ইচ্ছুক, চাণক্যকে পদচ্যুত করে পত্রলেখকের যেমন প্রীতি উৎপাদন করা হয়েছে, এবার পূর্বে উল্লিখিত বণ্টনের ব্যবস্থা করে সেই প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করা হোক, সিদ্ধার্থকের সঙ্গের অলঙ্কারগুলিও রাক্ষসকে প্রদত্ত হয়েছিল আর প্রহারের ভয়েই যেন সিদ্ধার্থক স্বীকার করে এই পত্র শকটদাসের লিখিত এবং রাক্ষস কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তসকাশে প্রেরিত। শকটদাস রাক্ষসের পরম মিত্র—অতএব রাক্ষসের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে মলয়কেতুর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চাণক্যের ভেদনীতি সার্থকতার পথে।

এদিকে চাণক্যের জনৈক গুপ্তচর সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিরূপে রাক্ষসের আশ্রয়ে থেকে মলয়কেতুর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে রাক্ষসই বিষকন্যা প্রয়োগে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছে। অতএব ক্ষুব্ধ, রুষ্ট মলয়কেতু বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করলেন রাক্ষসকে—ক্রুদ্ধ অন্তরে বললেন—'তদ্ গচ্ছ, সমাশ্রিয়তাং সর্বাত্মনা চন্দ্রগুপ্তঃ—যাও, চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় ভিক্ষা কর। চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত ও তুমি—এই তিনজনের বিনাশেই আমি সমর্থ। হতবাক্ রাক্ষস বুঝলেন, চাণক্যের কূটনীতির ফলেই এই বিপর্যয়। অপরিণামদর্শী মলয়কেতু তাঁর সঙ্গী রাজাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। শুধুমাত্র সেই পত্রের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মলয়কেতু মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে; বলা বাহুল্য, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদের

হাতে বন্দী হলেন তিনি। রাক্ষস উপায়ান্তর না দেখে ছদ্মবেশে গোপনে প্রবেশ করলেন রাজধানী কুসুমপুরে।

চাণক্যের কাছে চর মারফত সমস্ত সংবাদই পৌঁছয়, রাক্ষসের গতিবিধি অনুসরণ করে চলে তাঁর গুপ্তচর। আত্মগোপন করে রাক্ষস উপস্থিত হন পাটলিপুত্রের এক ভগ্ন পরিত্যক্ত উদ্যানে—সহসা তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি সেখানে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করার প্রয়াসে নিরত। কারণ অনুসন্ধান করায় জানতে পারলেন—বণিক চন্দনদাসের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনে তার সখা বিষ্ণুদাস আগুনে প্রাণ বিসর্জন করার সংকল্প করেছেন। এই ব্যক্তি বিষ্ণুদাসের বিশিষ্ট বন্ধু—মিত্রের জীবন-নাশের আশঙ্কায় দারুণ শোকে সেও জীবন বিসর্জনে অভিলাষী। এই ঘটনায় রাক্ষসের অন্তরে বিবেকের দংশন তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। তাঁর জন্যই চন্দনদাসের এই শোচনীয় দুর্গতি। নিজের শরীরের বিনিময়ে আশ্রিতবৎসল পরম সুহৃদকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলেন রাক্ষস।

চণ্ডালরা চন্দনদাসকে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে, ক্রন্দনরত স্ত্রী ও পুত্র তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। নানা সান্ত্বনাবাক্যে চন্দনদাস তাদের নিবৃত্ত করার প্রয়াস পান—'স্বর্গং গতানাং তাবদ্দেবাঃ দুঃখিতং পরিজনমনুকম্পন্তে।' মিত্রের কাজেই আমার মৃত্যুবরণ, অতএব দুঃখিত পরিজনদের সহায় হবেন দেবতারা। রাক্ষসের আর সহ্য হয় না—আত্মপ্রকাশ করে তিনি বলে ওঠেন—'এই ব্যক্তির পরিবর্তে বধার্থ আমাকে গ্রহণ কর।' উল্লসিত ঘাতক রাক্ষসের ধরা পড়ার সংবাদ দিতে গেল চাণক্যকে। চাণক্য সেই স্থানে এসে সসম্ভ্রমে নতি জানালেন নন্দরাজের অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাক্ষসকে। প্রকাশ করলেন—সমস্ত পরিকল্পনা তাঁরই। চণ্ডালবেশী সিদ্ধার্থক ও সমিদ্ধার্থক প্রকৃত পক্ষে তাঁরই অনুচর—সেই কপট পত্র ও অলঙ্কার, আর উদ্যানের সেই প্রাণত্যাগেচ্ছু পুরুষ সবই তাঁর কৌশল। এ সমস্ত ছলনার পশ্চাতে উদ্দেশ্য একটিমাত্র—রাক্ষসকে পাটলিপুত্রে এনে চন্দ্রগুপ্তের

মন্ত্রিত্বগ্রহণে সম্মত করান। এখন তিনি রাজী না হলে চন্দনদাসের মুক্তিও সম্ভবপর নয়। বাধ্য হয়ে রাজী হতে হলো রাক্ষসকে। নমস্কার সেই মিত্রস্নেহকে যা এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। 'নমঃ সর্বকার্য-প্রতিপত্তিহেতবে সুহৃৎস্নেহায়।' চন্দ্রগুপ্তও এসে প্রণতি জানালেন রাক্ষসের উদ্দেশ্যে। চাণক্যের আদেশে মলয়কেতু ও অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের বন্ধন হলো মুক্ত; চন্দনদাস প্রতিষ্ঠিত হলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মণিকারের পদে, চাণক্যের নীতিবৃক্ষের ফল ফলল, প্রতিজ্ঞা হলো পূর্ণ। রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদে বৃত করে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বররূপে দেব চন্দ্রগুপ্তকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন চাণক্য। এখন তাঁর করণীয় সমাপ্ত। নন্দবংশের উচ্ছেদ, রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা ও রাক্ষসের সঙ্গে মৈত্রী—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ—'রাক্ষসেন সমং মৈত্রী রাজ্যে চারোপিতা বয়ম্। নন্দাশ্চোন্মূলিতাঃ সর্বে, কিং কর্তব্য-মতঃ প্রিয়ম্ ॥'

মালতী-মাধব

দেবরাত ও ভূরিবসু—দুই বাল্যসখা। শিক্ষালাভ করেন একই গুরুগৃহে। অধ্যয়নশেষে বিদায়লগ্ন আসন্ন। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করেন ভবিষ্যতে পুত্রকন্যার জনক হলে তাদের বিবাহের সূত্রে বাঁধা পড়ে দূর করবেন এই বিচ্ছেদের দুঃখ—চিরস্থায়ী হবে বন্ধুত্ব।

দিন যায়। বিদর্ভরাজ্যের মন্ত্রিত্ব লাভ করলেন দেবরাত আর ভূরিবসু হলেন পদ্মাবতীনগরের প্রধান অমাত্য। দেবরাতের পুত্র মাধব সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে ওঠলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাকে প্রেরণ করা হলো পদ্মাবতীনগরে। মন্ত্রী ভূরিবসুর একমাত্র কন্যা মালতী গবাক্ষপথে দেখেন অশ্বারোহী এক রূপবান যুবককে—আভিজাত্য ও শৌর্যের প্রতিমূর্তি যেন! মুহূর্তেই তিনি মালতীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবতারূপে। কুমুদিনী যেন আবদ্ধ হলো চন্দ্রের কিরণজালে! ক্ষণিকের দেখা অজ্ঞাতপরিচয় সেই তরুণ পথিকের চিত্রাঙ্কন করে মালতী অদর্শনের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকী পরিবারের বন্ধু ও মালতীর শুভার্থী। মালতীর বেদনা তাঁকে অভিভূত করে—দুজনের সাক্ষাৎ ঘটানোর জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।

একদিন মদনোৎসব উপলক্ষে সখীদল নিয়ে মালতী এসেছেন মদনোদ্যানে—উদ্দেশ্য, কামদেবতার অর্চনা। কামন্দকীর কৌশলে মাধবও উপস্থিত সেই উদ্যানে। বকুলবৃক্ষের তলদেশে বসে প্রতীক্ষার অবসরে তিনি গেঁথে চলেন একটি বকুলের মালা। সহসা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাস্যময়ী একদল তরুণী—মধ্যবর্তিনী কে ওই বরাঙ্গনা—যেন প্রভাতের শিশিরস্নাত শুভ্র কমলকলি! যৌবনভারে অবনতাঙ্গীর অপাঙ্গদৃষ্টি তাঁর চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে; ললনাকুল

ধীরে ধীরে চলে গেল তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে—মাধবের হৃদয়ে অসীম শূন্যতা। কিন্তু আশার আলো নিয়েই বুঝি এগিয়ে আসে এক সখী—প্রার্থনা করে মাধবের গাঁথা সেই বকুলমালিকাটি। মাধব জানতে পারেন—যে বামাকুলোত্তমা তাঁকে মুগ্ধ করেছেন তিনিই মন্ত্রিকন্যা মালতী। একথাও তাঁর অজ্ঞাত রইল না যে, মালতী পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। সখী লবঙ্গিকা মাধবকে দেখায় মালতীর আঁকা মাধবের ছবিখানি। নিজের প্রতিকৃতির পাশে তিনি আঁকলেন মালতীর চিত্র; হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করে রচনা করলেন একটি শ্লোক—

"এ ধরার মাঝে আছে কত ধন
সুন্দর তারা সবি,
আমার জগতে উৎসব জাগে
তব দরশন লভি।"

বিরহক্লিষ্টা মালতীর কাছে পৌঁছাল সেই মালা ও ছবি। এ দুটিই হোল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। মালতীকে দেখার পর থেকে মাধবও অনন্যচিত্ত; বন্ধু মকরন্দের কাছে প্রকাশ করেন তাঁর অন্তর-বেদনা, উভয়পক্ষেই আকর্ষণ তীব্র, আর অভিভাবকেরাও অঙ্গীকার-বদ্ধ। তবে আর বাধা কোথায়? কিন্তু প্রকৃত প্রেমের পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মালতী-মাধবের মিলন পথেও ছিল অন্তরায়।

রাজার সখা নন্দন—মন্ত্রিকন্যার পাণিপ্রার্থী, রাজারও সম্মতি ছিল এতে। রাজমন্ত্রী ভূরিবসুর পক্ষে রাজার ইচ্ছার অবমাননা করা দুঃসাধ্য, অতএব বাধ্য হয়েই তিনি নন্দনকে কন্যাদানের অঙ্গীকার করলেন। মালতীর কাছে পৌঁছাল সেই সংবাদ—বেদনায় তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ—জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন। সন্ন্যাসিনী কামন্দকী মালতীর দুঃখে কাতর হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর সহায়তায়।

মালতী একদিন শিবপূজার জন্যে মন্দিরে এলেন—সঙ্গে সখী লবঙ্গিকা। তাঁকে যেতে হলো দেবালয়-সংলগ্ন উদ্যানে—পুষ্পচয়নের প্রয়োজনে। কামন্দকীও উপস্থিত। তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব থেকেই মাধব সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন। লবঙ্গিকার কৌশলে কামন্দকীর কাছে প্রকাশিত হয় মালতীর অসহনীয় অবস্থার কথা—বিরহের ব্যথাভারে অঙ্গ তাঁর কৃশপাণ্ডুর, মদনতাপে দগ্ধ হচ্ছেন দিবারাত্র। তাঁর অতুলনীয় অঙ্গশোভা সূর্যকিরণ-সংপৃক্ত মৃণালের মতই ম্লানিমা প্রাপ্ত হয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী অবসিত হয়ে যায়—কর্পূরবাসিত চন্দনবারি, পদ্মপত্রে শয়ন, শীতল কোমল চন্দ্রকান্তমণির স্পর্শ—কিছুই দূর করতে পারে না তাঁর বিরহের খর তাপ। বলাবাহুল্য, মাধবের শ্রবণে পৌঁছায় এই কথোপকথন, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি—মালতী সন্ত্রস্তা, বাঞ্ছিতের সান্নিধ্যে বিহ্বলা, নির্নিমেষলোচনে দুজনে পান করে চলেন দুজনের রূপসুধা।—সহসা তাঁদের সেই গভীরতম উপলব্ধির মুহূর্তটুকু ভেঙে খান খান হয়ে গেল সাবধান বাণীর উচ্চরবে—"এক ব্যাঘ্র পিঞ্জরের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছে—পথের সকলেই তার শিকারে পরিণত হচ্ছে।"—সকলেই সচকিত, ভয়ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পুনরায় শোনা গেল এক করুণ আর্তধ্বনি—"রাজসখা নন্দনের ভগিনী ব্যাঘ্রের কবলে।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল মাধবের বন্ধু মকরন্দ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই ভয়াল ব্যাঘ্রটিকে নিহত করেছেন—মদয়ন্তিকার জীবন রক্ষা পেয়েছে। সর্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত, অচেতনপ্রায় মকরন্দকে নিয়ে মদয়ন্তিকা প্রবেশ করেন। মাধব প্রিয় সখার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। অবশেষে মদয়ন্তিকার সযত্ন পরিচর্যায় ধীরে ধীরে মকরন্দের জ্ঞান ফিরে এলো। দুজনের মধ্যে জন্ম নিল প্রীতির অঙ্কুর—কৃতজ্ঞতার বীজ ক্রমশ পরিণত হলো প্রেমের মহীরুহে।

কুসুমোদ্যানে সেই সাক্ষাৎকার মালতী-মাধবের অনুরাগকে গাঢ়তর

করে তোলে,—পরস্পরের মন জানাজানির পালা সাঙ্গ। কিন্তু তাঁদের সুখস্বর্গে নেমে এল অশনি-সম্পাত। প্রকাশ্যে ঘোষিত হলো নন্দনের সঙ্গে মালতীর ভাবী বিবাহের সংবাদ—রাজার ইচ্ছা অনুসারে মন্ত্রী ভূরিবসুকে রাজী হতে হয়। লগ্নও সুনির্দিষ্ট, তবে কী নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম পরিহাসে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে মালতী-মাধবের প্রেমকোরকটি ?

মালতীকে পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। দুর্ভাগ্যের এই নির্দয় আঘাতে বিচলিত মাধব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে এসেছেন শ্মশানে। প্রেতপিশাচদের বিচরণভূমি এই মহাশ্মশান অমাবস্যার গাঢ়কৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! শবদাহ-জনিত অগ্নির লেলিহান শিখা—সঞ্চরণশীল শৃগালদের জ্বলন্ত চক্ষু—এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু মাধব নিঃশঙ্ক। প্রাণপ্রিয়া মালতীই জীবন থেকে বিদায় নিতে চলেছেন। শ্মশানের বীভৎসতা আর এমন কি বেশী ক্ষতি করবে তাঁর। ইতস্তত বিচরণ করেন মাধব। সহসা তাঁর কানে এলো নারীকণ্ঠের রোদন—ব্যাধবিদ্ধা হরিণী যেন শেষ আর্তনাদে নিয়তির বিরুদ্ধে জানাচ্ছে তাঁর করুণ অভিযোগ। ভয়ঙ্কর কাপালিক অঘোরঘণ্ট অমাবস্যার নিশীথে শ্মশানের কালীমন্দিরে নরবলি দিয়ে সিদ্ধ করবে তার তন্ত্রসাধনা ; প্রচণ্ডা অনুচরী কপালকুণ্ডলা এই উদ্দেশ্যে সুলক্ষণা কুমারী কন্যার অন্বেষণে নগরে এসেছিল। করুণ বিলাপে আকৃষ্ট হয়ে মাধব মন্দিরে এসে দেখেন তাঁরই বাঞ্ছিতা মালতী জালে বদ্ধ মৎসীর মতই কপালকুণ্ডলার কবলগ্রস্তা, পূজার সমস্ত উপচার প্রস্তুত—অঘোরঘণ্ট এবার মালতীকে লক্ষ্য করে উদ্যত করল তার খড়্গ—কিন্তু বাধা পেল মাধবের আক্রমণে। অঘোরঘণ্টকে নিহত করে মাধব মালতীকে উদ্ধার করলেন। নিতান্তই স্ত্রীলোক বলে কপালকুণ্ডলা নিষ্কৃতি লাভ করল—কিন্তু আহতা ফণিনীর মতই জ্বলন্ত প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। মালতীর সন্ধানে আগত পিতার প্রেরিত পুরুষদের হাতে মালতীকে অর্পণ করেন মাধব।

৭

অল্পদিনের মধ্যেই নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। নির্দিষ্ট দিনটিতে বিশাল শোভাযাত্রার সঙ্গে সখী-পরিবৃতা হয়ে মালতী চলেছেন নগরদেবতার মন্দিরে। দেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার পর তাঁকে বিবাহসজ্জায় ভূষিত করা হবে। জনতাকে বাইরে রেখে শুধুমাত্র সহচরী লবঙ্গিকা সহ মালতী মন্দিরে প্রবেশ করেন। নির্জন দেবগৃহ, শুধু একটি প্রদীপ জ্বালা। আকুল আবেগে মালতী ভেঙ্গে পড়েন দেবমূর্তির চরণে—নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের দুঃসহ বেদনা। মাধবের সঙ্গে মিলন বুঝি ইহজীবনে আর সম্ভব হলো না। শেষবারের মত প্রণাম জানিয়ে বাষ্পাবৃত মুখটি তুলে পার্শ্বে প্রতীক্ষারতা লবঙ্গিকার গলায় দিয়ে দিলেন বিদায়-উপহারস্বরূপ মাধবের গাঁথা সেই বকুলের মালাটি, যা এতদিন রক্ষিত ছিল তাঁর কোমল উষ্ণ বক্ষে, বুঝি মুক্ত হতে চাইলেন স্মৃতির কণ্টক-যন্ত্রণা থেকে। কিন্তু কার গলায় পড়ল তাঁর মালা ? উষ্ণ পরুষ আলিঙ্গনে কে দিল তাঁকে উপহারের প্রতিদান ? নারীর কোমল স্পর্শ তো এ নয়। প্রণতা মালতীর একাগ্রতার অবসরে কখন মাধব এসে লবঙ্গিকার স্থান গ্রহণ করেছেন—এ সমস্ত ঘটনাই ঘটছে কামন্দকীর পরিকল্পনা অনুসারে। সেই মুহূর্তেই কামন্দকী এসে জানালেন—তোমরা এক্ষুণি মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়ে চলে যাও নগরপ্রান্তের বৌদ্ধমঠে—সেখানে প্রস্তুত আছে বিবাহের আয়োজন। প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিণী কামন্দকী তাদের আশিস্ জানিয়ে উপদেশ দিলেন—

“প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা
সর্বে কামাঃ শেবধির্জীবিতঞ্চ।
স্ত্রীণাং ভর্ত্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসা-
মিত্যন্যোন্যং বৎসয়োর্জ্ঞাতমস্তু ॥”

“পতি ও পত্নী—উভয়েই উভয়ের কাছে প্রিয়বন্ধু, পরমাত্মীয়,

কথা কামনার ধন ও জীবনসর্বস্ব—এই সব তোমরা মনে রেখো।” কামন্দকীর আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে তাঁরা যাত্রা করলেন সেই নির্দেশিত পথে।

এদিকে মালতীর জন্য আনীত বিবাহসজ্জায় সজ্জিত করা হলো মকরন্দকে। নন্দনকে উপহাসের অয়োজন সম্পূর্ণ। যথারীতি বিবাহের অনুষ্ঠানে অবগুণ্ঠিত মালতী-বেশী মকরন্দকে অর্পণ করা হলো নন্দনের হস্তে। ফুলশয্যার রাত্রে দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত বাসনা পরিতৃপ্তির আশায় এগিয়ে আসেন নন্দন মালতীর দিকে—কিন্তু নব-বধূর দারুণ পদাঘাতে তাঁর গতি হ'লো রুদ্ধ। উন্মত্ত হয়ে উঠলেন তিনি···কুলটা স্ত্রীর আর কখনই মুখদর্শন করবেন না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই গভীর রাত্রেই গৃহত্যাগ করলেন।

ভ্রাতার এই অপমান মদয়ন্তিকাকে বিচলিত করে তোলে। শান্তি-স্থাপনের শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে পরদিন তিনি এলেন নববিবাহিতা ভ্রাতৃবধূর দ্বারে। বস্ত্রাবৃতা সুন্দরী নিদ্রিতা। লবঙ্গিকার অনুরোধে মদয়ন্তিকা প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এই অবসরে লবঙ্গিকার সঙ্গে রহস্যালাপ চলতে থাকে। মদয়ন্তিকা প্রকাশ করে ফেলেন মকরন্দের জন্যে তাঁর দুর্নিবার প্রেমের কথা। কপট নিদ্রায় আক্রান্ত মকরন্দের শ্রবণের অগোচর থাকে না কিছুই। লবঙ্গিকা অন্তরালে যেতেই মকরন্দ দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন দয়িতাকে—ছদ্ম নারীবেশ ত্যাগ করে প্রকাশ করেন নিজের পরিচয়। কামন্দকী-শিষ্যা বুদ্ধরক্ষিতার পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরাও যাত্রা করলেন সেই বৌদ্ধবিহারের উদ্দেশ্যে।

যথাসময় রাজার কর্ণগোচর হলো সমস্ত সংবাদ, পথেই মকরন্দকে বন্দী করার জন্যে তিনি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। কোনক্রমে বিশ্বস্ত ভৃত্য কলহংস ও লবঙ্গিকা সহ মদয়ন্তিকাকে গুপ্তপথে সেই বৌদ্ধমঠের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে মকরন্দ সৈন্যদলকে বাধা দিতে থাকেন। এই সংবাদ মালতী ও মাধবের কাছে পৌঁছল—মাধবও সখার সহায়তার জন্যে অগ্রসর হলেন। মালতী একা সেই বিহার-

সংলগ্ন উদ্যানে চঞ্চলচিত্তে প্রতীক্ষা করতে থাকেন মাধবের। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তন্ত্রসাধিকা কপালকুণ্ডলা। মালতীর একাকিত্বের সুযোগে বাজপাখির মতই অন্তরীক্ষ থেকে নেমে এসে মালতীকে নিয়ে অন্তর্হিত হল। বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুই বন্ধু ছিন্নভিন্ন করে দেন সৈন্যদলকে। রাজা স্বয়ং প্রাসাদশিখর থেকে যুদ্ধ-দৃশ্য দেখছিলেন—দুই সখার বীরত্ব মুগ্ধ করে তাঁকে। মাধব ও মকরন্দকে প্রাসাদে আহ্বান করে রাজা তাঁদের সম্মানিত করলেন। ক্ষমা করা হলো তাঁদের পূর্বতন সকল অপরাধ। হৃষ্ট চিত্তে তাঁরা ফিরে এলেন সেই বিহারে। ত্বরিত পদে আশ্রমে প্রবেশ করেন মাধব অজানা কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় বক্ষ তাঁর দুরু দুরু। ব্যস্ত চরণে মালতীর অন্বেষণ করেন তিনি। কোথায় মালতী? মাধবের করুণ বিলাপে ব্যস্ত হয়ে যায় উদ্যান-প্রকৃতি। সীতার জন্যে রামের, উর্বশীর জন্যে পুরূরবার বিলাপও বুঝি এমনই মর্মস্পর্শী!

জীবনে বীতস্পৃহ মাধব সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন মালতীর সন্ধানে—সঙ্গে সখা মকরন্দ। অবশেষে তাঁরা উপস্থিত হলেন সিন্ধু ও পারা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত পর্বতের কাছে। পর্বতের সমতলে চিত্তাকর্ষক বনভূমি—প্রাকৃতিক শোভায় নয়নাভিরাম। শুভ্রধারা নদীগুলি যেন সেই বনলক্ষ্মীর কণ্ঠে মুক্তাহার—বেতস, কুটজ, লোধ্র, কেতকী-কদম্ব—নানা পুষ্পের সমারোহ যেন উৎসব-সাজে সজ্জিত করেছে সেই অরণ্য-প্রকৃতিকে। বর্ষা আসন্ন—ঘনকৃষ্ণ মেঘের পুঞ্জ, নৃত্যরত ময়ূর, শীতল বায়ু—এ সমস্তই মাধবের দুঃখকে অসহনীয় করে তোলে। গভীর বেদনায় তাঁর চেতনা লুপ্ত হ'লো। বন্ধুর এই কাতর অবস্থা দেখে দুঃখে মকরন্দও প্রাণত্যাগে উদ্যোগী হলেন—সহসা এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটল। ইনি কামন্দকীর শিষ্যা শ্রীপর্বত-নিবাসিনী সৌদামিনী। তাঁদের মিলিত প্রয়াসে মাধবের জ্ঞান ফিরে এলো। সৌদামিনী বিবৃত করেন মালতীর সংবাদ। কপালকুণ্ডলা মালতীকে সেই উদ্যান থেকে অপহরণ করে শ্রীপর্বতে

আনে হত্যার উদ্দেশ্যে। মালতীর কাতর বিলাপ সৌদামিনীকে আকৃষ্ট করে। কপালকুণ্ডলার কবল থেকে তিনি রক্ষা করেন মালতীকে সমস্ত বিবরণ অবগত হয়ে তিনি মাধবের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এখন সফল হয়েছে তাঁর প্রয়াস। মাধব সৌদামিনীর সঙ্গে উপনীত হলেন মালতীর কাছে। মকরন্দ, মদয়ন্তিকা, কামন্দকী —সকলের আগমনে মুখর হয়ে উঠল পর্বতশিখর—সকলের চক্ষুতেই আনন্দাশ্রু। বহু বাধা অতিক্রম করে দুটি প্রাণ বাঁধা পড়ল এক অচ্ছেদ্য মিলনের সূত্রে।

পরিশিষ্ট

সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে মঞ্চের ব্যবহার ছিল কিনা এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মঞ্চ সম্বন্ধে-যে বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে কীথ, স্টেনকোনো প্রমুখ পাশ্চাত্য সমালোচকেরা তাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের মতে নাট্যকলার প্রয়োগক্ষেত্র প্রধানতঃ দেবালয় বা রাজপ্রাসাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষ হলেও এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত সভাগৃহ বা প্রয়োগশালাও ছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি গুহার কথা। এই গুহা-প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপথের প্রস্তরভূমিতে গভীর গর্ত পর্দার জন্য প্রোথিত খুঁটির কথা মনে করিয়ে দেয়। ল্যুডার্স ও জনসাধারণের প্রমোদস্থান হিসাবে গুহাগুলির গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে (২. ৬৯)-এ বলা হয়েছে প্রেক্ষাগৃহের আকৃতি গুহার মত ও দ্বিতলবিশিষ্ট হবে। এখানে প্রেক্ষাগৃহের তিনরকম গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—(১) বিকৃষ্ট—একশ' আট হাত বিশিষ্ট (এক হাত=আঠারো ইঞ্চি)। (২) চতুরস্র—দৈর্ঘ্যে চৌষট্টি হাত, প্রস্থে বত্রিশ হাত। এই প্রেক্ষাগৃহ শুধুমাত্র রাজকুমারদের জন্যে। (৩) ত্রিস্র—বত্রিশ হাত দৈর্ঘ্যযুক্ত। চতুরস্র মঞ্চকেই সর্বোত্তম বলে মনে করা হ'তো।

প্রয়োগশালা বা প্রেক্ষাগৃহ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত—মঞ্চ অর্থাৎ অভিনয়স্থান এবং দর্শকদের আসন। কাষ্ঠনির্মিত শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনগুলির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট স্তম্ভদ্বারা পৃথকীকৃত—শুভ্রবর্ণের স্তম্ভবিশিষ্ট স্থান ব্রাহ্মণদের জন্যে ও রক্ত-বর্ণের স্তম্ভবিশিষ্ট স্থান ক্ষত্রিয়দের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। উত্তর-পশ্চিম

কোণে পীতবর্ণের স্তম্ভযুক্ত স্থান বৈশ্যদের ও উত্তর-পূর্বের কৃষ্ণ বা নীল স্তম্ভসমন্বিত স্থানটি শূদ্রদের জন্যে চিহ্নিত। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক বর্ণ বৈষম্যের ধারা প্রেক্ষাগৃহেও, যা অনেকাংশে সামাজিক মিলন ক্ষেত্র, অনুসৃত হয়ে এসেছিল। দর্শকাসনের সন্মুখস্থ অভিনয়স্থানের নাম ছিল 'রঙ্গস্থল' বা 'রঙ্গপীঠ'। এই অংশটি নানা চিত্র ও মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হতো। মঞ্চের পাশে যে অলিন্দের (করিডোর) মত স্থান থাকত তাকে বলা হত 'মত্তবারণী'।

'চতুরস্র' মণ্ডপের মঞ্চটি হতো চতুষ্কোণ—আট হাত লম্বা ও আট হাত চওড়া। মঞ্চের পিছনের পর্দাটিকে বলা হতো 'পটী', 'অপটী', 'প্রতিশীরা' বা তিরস্করিণী'। কোনো (কোনো আধুনিক ব্যাখ্যাকার অবশ্য 'পটী' বা 'তিরস্করিণী' শব্দ পর্দা অর্থে প্রযুক্ত বলে স্বীকার করতে রাজী নন, তাঁদের মতে এই শব্দটির অর্থ অভিনেতা-অভিনেত্রীর আবরণী বা আচ্ছাদনী।)[১] সংস্কৃত নাটকে বহু-ব্যবহৃত 'যবনিকা' শব্দটি বিদগ্ধজনকে নানা চিন্তার অবকাশ দিয়েছে। অনেকে মনে করেন, 'যবন' শব্দের অর্থ 'গ্রীক' এবং 'যবনিকা' হচ্ছে গ্রীসদেশ থেকে আনীত বস্ত্রনির্মিত মঞ্চের আবরণ। এই বিষয়টি থেকেই তাঁরা সংস্কৃত নাটকে গ্রীক্ প্রভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো পাশ্চাত্ত্য বা বিদেশীকেই (পারসীক, আইওনিয়ান ইত্যাদি) 'যবন' শব্দে চিহ্নিত করা হ'তো সুতরাং 'যবনিকা' যে কোনো পশ্চিমদেশীয় দ্রব্য।

পিছনের পর্দার পিছনের দু'টি দ্বার দিয়ে যাওয়া যেত নেপথ্য-গৃহে—এইখানেই অভিনেতাদের সাজসজ্জার ব্যবস্থা থাকত; এমনকি নাটকের প্রয়োজনে বহুকণ্ঠের মিলিত চীৎকার, দৈববাণী ইত্যাদিও এই 'নেপথ্য' থেকেই করা হতো বলে মনে করা হয়। এই দুই দ্বারের মধ্যস্থানটি সম্ভবতঃ বাদকদলের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

১ শ্রীসুকুমার সেন—নট নাট্য নাটক—পৃঃ—৯৪

নাটকীয় চরিত্রগুলির পরিচ্ছদ ও সজ্জা সম্বন্ধেও নাট্যশাস্ত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। 'শুদ্ধ' (অরঞ্জিত), 'বিচিত্র' (রঞ্জিত) ও 'মলিন' (অপরিচ্ছন্ন)—এই তিন ধরনের পরিচ্ছদের কথা বলা হয়েছে। আভীর কন্যাদের বস্ত্র 'ঘননীল', সন্ন্যাসীদের 'বাকল', রাজপুত্রদের বিচিত্র-উজ্জ্বল ও ব্রহ্মচারী আর অন্তঃপুরকর্মীরা কাষায় বস্ত্রধারণ করবেন। পাত্রপাত্রীদের কেশ সম্বন্ধেও নির্দেশিকা আছে। পিশাচ, ভূত ও পাগলদের অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল কেশ, ভৃত্যদের বর্ধিত কেশ ও শিশুদের গুচ্ছাকৃতি কেশের কথা বলা হয়েছে। এই থেকে অনায়াসে মনে করা যেতে পারে, 'পরচুলা'র প্রয়োগ অজ্ঞাত ছিল না —চরিত্র অনুসারে নির্মিতকেশ ব্যবহার করা হ'তো। বিদূষকের বৈশিষ্ট্য তার ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ কেশহীনতায়। অভিনেতাদের গাত্রত্বকে বর্ণলেপন করে স্থান বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হ'তো। অন্ধ্র-দ্রাবিড় ও কাশী-কোশল ইত্যাদি প্রদেশের লোকদের জন্যে কৃষ্ণবর্ণের, শক-যবন ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী বোঝাতে গৌরবর্ণের, পাঞ্চাল-শূরসেন-মগধ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ইত্যাদি স্থানের লোকদের জন্যে শ্যামবর্ণের প্রলেপ ব্যবহার করা হ'তো। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা গৌরবর্ণের ও বৈশ্য-শূদ্রেরা শ্যামবর্ণের অনুলেপনে নিজেদের বর্ণগত বৈষম্য ফুটিয়ে তুলতেন।

এই সমস্ত আলোচনা একথাই প্রমাণ করে যে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের একটি পরিশীলিত ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল এবং নাটকের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে ভরত প্রমুখ নাট্যাচার্যরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।